ইমাম জাওয়াদ (আ.)

দার রাহে হাক প্রকাশনীর লেখকবৃন্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহর নামে

ভূমিকা

নিঃসন্দেহে সৃষ্টির বিস্ময়কর ঘটনাবলীর মধ্যে ভূপৃষ্ঠে মানুষকে খলিফারূপে প্রেরণ করাই হচ্ছে সর্বাধিক বিস্ময়কর ঘটনা। যদি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব অন্যান্য সৃষ্টির উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তার খলিফাতুল্লাহ হওয়া। কবি হাফিজ যথার্থই বলেছেন :

আসমান আমানতের বোঝাকে করতে পারেনি বহন,

পড়েছে ফলনামা এ অধমেরই নামে তখন।

হযরত আদম (আ.) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে হযরত মাহদী (আ.) পর্যন্ত খোদা পরিচিতি ও আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে, তাঁরা খনিজ কয়লার মত দাহ্যমান জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বেলায়েতের অধিকারী ছিলেন।

আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ এ দৃঢ়পদীরা ছিলেন সৃষ্টির সেরা, সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা এবং সকলের নেতা বা ইমাম। তাঁদের প্রত্যেকের জীবনধারা, তাদের ঐশী জ্ঞান, আচার-ব্যবহার ও ব্যক্তিত্ব, তা কোন সাধারণ জীবন যাপন ছিল না এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনাবলীর নিদর্শন তাদের জীবন ধারায় পরিলক্ষিত হয়। হযরত নুহ (আ.) প্রায় সহস্র বছর জীবন যাপন ও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ (আ.)- এর দুশমনদেরকে প্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলেন। হযরত হুদ ও সালেহ (আ.)- এর বিরোধীদের উপর আসমান থেকে আল্লাহ্ আযাব নাযিল করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.) প্রজাপতির ন্যায় আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশে তা ফুলবাগানে রূপান্তরিত হয়েছিল। মূসা (আ.) আল্লাহর ইচ্ছায় তার লাঠিকে ফেরাউনদের জন্য বিশালদেহী সাপে রূপান্তরিত করেছিলেন। সুলাইমান (আ.) বাতাসকে নির্দেশ দিতেন এবং পশু-পাখির সাথে কথা বলতেন। ঈসা (আ.) মৃতকে জীবিত করতেন। মহানবী (সা.) বিভিন্ন প্রকার বিস্ময়কর ঘটনাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাঁর জন্মের সাথে সাথে মূর্তি সমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। খসরুর প্রাসাদের চৌ টি ভে গিয়েছিল। পার র সহস্র বছরের অ ি ও নিভে গিয়েছিল। তাঁর নবুওয়াতের ভিত্তিতে পৃথিবী বদলে গিয়েছিল এবং মানব জীবনের এক নতুন

অধ্যায় সূচিত হয়েছিল। সত্যিই বিশ্বের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে মানুষের খলিফাতুল্লাহ হওয়া। এই বিস্ময়কর অনুগ্রহ যার উপরই ভাস্বর হয়েছিল, যুগপৎ বিস্ময়কর ঘটনাবলীর অধিকারী ও তিনিই ছিলেন ।

বিশেষ করে সকল নবী ও ইমামগণের পারিবারিক শিক্ষার বিষয়টি এ বিস্ময়কর ব্যপারগুলোর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা তাঁরা পৃথিবীর কোন মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, বরং তাঁদের জ্ঞানের উৎস ছিল স্বয়ং চিরন্তন সত্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই (শিক্ষার জন্য পরমুখাপেক্ষী না হওয়া) আল্লাহর খলিফাদের খেলাফত ও রেসালাতের ক্ষেত্রে বয়সের কোন ভূমিকা ছিল না, বরং আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমোদনে যে কোন সময় এবং যে কোন বয়সে মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর নবী অথবা ইমাম হিসাবে প্রেরিত হতে পারেন। যেমন : অনেকে মধ্য বয়সে, কেউ বার্ধক্যে, কেউ যৌবনে কেউবা আবার শৈশবেই আল্লাহর খলিফার মত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্টিত হয়েছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমোদন ব্যতীত কেউই এ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন না। আর যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমোদন রয়েছে সেখানে বয়সের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না ।

পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, হযরত ইয়াহিয়া (আ.) বাল্যকালে এবং হযরত ঈসা (আ.) শৈশবে দোলনাতেই আল্লাহর খলিফা বা নবী নির্বাচিত হন।

(يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا)

অর্থাৎ হে ইয়াহিয়া! তুমি এই কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং আমরা তাকে বাল্যকালেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম (সূরা মারিয়াম : ১২)।

(قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا)

অর্থাৎ তারা বলল, আমরা তার সাথে কিভাবে কথা বলব, যে এক দোলনার শিশু? তিনি (হযরত ঈসা) বললেন, নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী মনোনীত করেছেন (সূরা মারিয়াম : ২৯- ৩০)।

অতএব, আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাঁরই ইচ্ছায় শৈশবে ইমামত প্রাপ্ত আমাদের কোন কোন পবিত্র ইমামের ইমামত প্রাপ্তির বিরোধিতা যারা করে, তা তাদের বোকামি ও বিবেকের অপরিপক্কতা বৈ কিছুই নয়। আমরা যা আলোচনা করেছি এবং কোরআনও যা অনুমোদন করে, একমাত্র অজ্ঞরা ছাড়া আর কেউই এ বিষয়ে আপত্তি করতে পারেনা যে, কিভাবে ইমাম জাওয়াদ (আ.) ৮/৯ বছর বয়সে ইমামতের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন?

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী আল জাওয়াদ (আ.) তাঁর মহান পিতার শাহাদতের পর পূর্ববর্তী ইমামগণের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, অষ্টম ইমামের পক্ষ থেকে পূর্বেই পৃথিবীতে ইমাম ও আল্লাহর খলিফার দায়িত্বশীল হিসাবে নিযুক্ত হন। ইমাম জাওয়াদের বয়স কম হওয়ার কারণে অজ্ঞরা প্রায়ই তাঁকে পরীক্ষা করত। কিন্তু ইমামের খোদায়ী জ্ঞানের দ্যুতি এতই বেশি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত যে, হযরত ইয়াহিয়া ও ঈসা (আ.)- এর শৈশবে নবুওয়াত প্রাপ্তির বিষয়টি প্রমাণের জন্য এই মহান ইমামের দৃষ্টান্ত আনা প্রয়োজন হতো অর্থাৎ তাঁদের নবুওয়াতকে ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর ইমামতের মাধ্যমে প্রমাণ করা হতো।

ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর জন্ম

অষ্টম ইমাম হযরত আলী ইবনে মূসা আর রেজা (আ.)- এর বয়স তখন চল্লিশেরও বেশি। কিন্তু তদোবধি কোন সন্তান তার ঘরে আসেনি। এ বিষয়টি শিয়াদের জন্য বেশ উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। কেননা তারা রাসূল (সা.) ও পবিত্র ইমামগণের রেওয়ায়েত থেকে এ বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে, নবম ইমাম হবেন অষ্টম ইমামেরই সন্তান। উপরোক্ত কারণেই তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন যে আল্লাহতায়ালা ইমাম রেজাকে একটি পুত্র সন্তান দান করুন। এমনকি তারা কখনো কখনো ইমাম রেজা (আ.)- এর কাছে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করার অনুরোধ জানাতেন, যেন মহান আল্লাহ্ তাঁকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। ইমাম রেজা (আ.) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন :

" আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে এমন এক পুত্র সন্তান দান করবেন যে আমার উত্তরাধিকারী ও আমার পরবর্তী ইমাম হবে " (বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ১৫; উয়ুনুল মুজিযাত পৃ. ১০৭)।

অবশেষ ১৯৫ হিজরীর ১০ই রজব, মতান্তরে রমযান মাসে ইমাম মুহাম্মদ তাকী (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ, নিয়াহ আবু জাফর এবং তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি হচ্ছে 'তাকী ' এবং 'জাওয়াদ ' ।

তাঁর জন্মের সুসংবাদে সম শিয়ারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন এবং তাদের ঈমান ও আকিদা আরও দৃঢ়তর হয়। কেননা হযরতের জন্ম বিলম্বে হওয়ায় শিয়াদের মধ্যে সন্দেহের যে স াবনা ছিল, তা দূর হয়ে গেল ।

ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর মাতার নাম 'সাবিকাহ ' । ইমাম রেজা (আ.) তাঁকে 'খিযরান ' বলতেন। এই মহীয়ষী রমণী রাসূল (সা.)- এর স্ত্রী মারিয়া কিবতির বংশের ছিলেন। তিনি চারিত্রিক গুণাবলীর দিক থেকে সে যুগের শ্রেষ্ঠা রমণী ছিলেন। রাসূল (সা.) এক রেওয়ায়েতে তাঁকে (সাবিকাহ)خير الاماء বা সর্বোত্তম দাসী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। (উসূলে কাফী, ১ম

খণ্ড, পৃ. ৩২৩) এই রমণী ইমাম রেজা (আ.)- এর গৃহে আসার পূর্বেই ইমাম মূসা ইবনে জাফর তার কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছিলেন এবং ইয়াযিদ ইবনে সালিতের মাধ্যমে তাকে সালাম পৌঁছিয়েছিলেন (উসূলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৫)।

ইমাম রেজা (আ.)- এর বোন হাকিমাহ বলেন : ইমাম রেজা (আ.) আমাকে ইমাম মুহাম্মদ তাকী (আ.)- এর জন্মের সময় খিযরানের কাছে থাকার নির্দেশ দেন। নবজাতক জন্মের তৃতীয় দিবসে আকাশের দিকে তাকাল অতঃপর ডানে ও বায়ে দেখল এবং বলল :

اشهدُ ان لا اله الاّ الله و اشهد انّ محمّداً رسول الله

' অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। '

আমি এই বিস্ময়কর ঘটনা অবলোকন করে তড়িৎ ভাইয়ের কাছে গিয়ে যা দেখেছি তা বর্ণনা করলাম। ইমাম রেজা (আ.) বললেন, 'যা দেখেছ তার চেয়ে আরও বেশি আশ্চর্যজনক ঘটনা ভবিষ্যতে তার থেকে দেখতে পাবে ' (মানাকেব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪)।

আবু ইয়াহিয়া সানয়ানী বলেন : ইমাম রেজা (আ.)- এর খেদমতে ছিলাম। এমন সময় ছোট্ট শিশু ইমাম জাওয়াদকে তাঁর কাছে আনা হলে তিনি বলেন : 'এই শিশু এমন শিশু যে, শিয়াদের জন্য তাঁর থেকে বরকতময় আর কেউই দুনিয়াতে আসেনি।'[১]

স বতঃ উল্লিখিত কারণেই (শিয়াদের মধ্যে সন্দেহ দূরীকরণের জন্য) হয়তো ইমাম এরূপ বর্ণনা করেছেন। কেননা ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর জন্মের মাধ্যমেই ইমামের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে শিয়াদের উদ্বেগের অবসান ঘটে। আর এভাবে শিয়াদের ঈমান সন্দেহের কলুষতা থেকে মুক্তি লাভ করে।

নোফেলি বলেন : ইমাম রেজা (আ.)- এর সাথে একত্রে খোরাসান যাওয়ার পথে তাঁকে সবিনয়ে নিবেদন করলাম : আমার প্রতি কোন আদেশ উপদেশ আছে কি? তিনি বললেন : 'তোমার প্রতি নির্দেশ হলো : আমার পর আমার পুত্র মুহাম্মদের অনুসরণ করবে। জেনে রাখ আমি এমন এক সফরে যাচ্ছি যেখান থেকে আর কোনদিন ফিরব না (উয়ুনু আখবারুর রেজা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬)।

ইমাম রেজা (আ.)- এর ব্যক্তিগত লেখক মুহাম্মদ ইবনে আবি ইবাদ বলেন, ইমাম রেজা (আ.) তাঁর পুত্র ইমাম জাওয়াদকে নিয়া ধরে সম্বোধন করতেন। (আরবদের মধ্যে যখন কাউকে সম্মানের সাথে স্মরণ করা হয় তখন তাকে নিয়া ধরে সম্বোধন করা হয়)। যখন ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর কাছ থেকে কোন পত্র আসত, ইমাম রেজা (আ.) খুশী হয়ে বলতেন, 'আবুজাফর আমাকে লিখেছে...।' আবার যখন ইমাম রেজা (আ.) আমাকে ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর কাছে চিঠি লিখতে বলতেন, তাঁকে সম্মানের সাথে খেতাব করতেন। আর ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর পক্ষ থেকে যে সম পত্র আসত, তা খুবই সুন্দর বাচন ভি ও বাক্যালংকারে পূর্ণ থাকত।

মুহাম্মদ ইবনে আবি ইবাদ আরও বলেন, ইমাম রেজাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলতেন, 'আমার পরে আবু জাফর হচ্ছে আমার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত' (উয়ুনু আখবারুর রেজা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০)।

মুয়াম্মার ইবনে খাল্লাদ বলেন, ইমাম রেজা (আ.) কিছু কথা স্মরণ করে বলেন : আমার থেকে শোনার প্রয়োজন নেই, আবু জাফরকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি, যে কোন প্রশ্ন ও সম া থাকলে তাকে প্রশ্ন করো সে জবাব দিবে। আমাদের পরিবার এমন এক পরিবার যে এ পরিবারের সন্তানরা তাঁদের মহান পিতাগণের কাছ থেকে ইলমের হাকিকাত (জ্ঞানের নিগুঢ় রহ) ও মারেফাত পূর্ণরূপে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকেন।[২] (উে শ্য এটাই যে পূর্বের ইমামের সম মর্যাদা এবং জ্ঞান পরবর্তী ইমামের কাছে স্থানান্তরিত হয়। আর এটা শুধুমাত্র ইমামগণের বেলায় প্রযোজ্য ইমামগণের অন্যান্য সন্তানদের বেলায় নয়।

খাইরানী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, খোরাসানে ইমাম রেজা (আ.)- এর খেদমতে ছিলাম, কেউ প্রশ্ন করল : যদি আপনি আমাদের মাঝ থেকে চলে যান তাহলে কার শরণাপন্ন হব? ইমাম রেজা (আ.) বলেন : 'আমার পুত্র আবু জাফরের শরণাপন্ন হবে।'

প্রশ্নকারী হয়ত ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর বয়সকে ইমামতের জন্য উপযুক্ত মনে করেনি এবং মনে করেছিল একটি বালক কিভাবে ইমামতের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে? ইমাম রেজা (আ.) বললেন : 'আল্লাহতায়ালা হযরত ঈসাকে শৈশবে দোলনাতেই নবুওয়াত দান করেছেন।

আর আবু জাফরতো এখন ৮ বছরের বালক, আল্লাহর কাছে কিছুই অস ব নয়" (উসূলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২২, এরশাদে শেখ মুফিদ, পৃ. ২৯৯)।

আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর বলেন, ইয়াহিয়া ইবনে সাফওয়ানের সাথে ইমাম রেজা (আ.)-এর নিকটে উপস্থিত হলাম। সেখানে তিন বছরের বালক ইমাম জাওয়াদও ছিলেন। ইমাম রেজাকে সবিনয়ে নিবেদন করলাম : আল্লাহ না করুন, আপনি যদি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যান, তাহলে আপনার উত্তরাধিকারী কে হবেন? ইমাম রেজা (আ.) আবু জাফরের দিকে ইশারা করে বললেন, আমার এ সন্তানই আমার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত। বললাম : এত কম বয়সে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এ বয়সেই। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ঈসা (আ.)-কে শৈশবেই নবুওয়াত দান করেছেন, অথচ তখন তাঁর বয়স তিন বছরও ছিল না (কেফায়াতুল আছার, পৃ. ৩২৪; বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ৩৫)।

ইমামতের শুরু

ইমামতও নবুওয়াতের ন্যায় আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ যা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর যোগ্য এবং মনোনীত বান্দাগণকে দান করেন। এক্ষেত্রে বয়সের তেমন গুরুত্ব নেই। যারা অল্প বয়সে কারও নবী বা ইমাম হওয়াকে অস ব বলে মনে করেন তারা এ আধ্যাত্মিক ব্যাপারকে সাধারণ ব্যাপারের সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন। যদিও এমনটি নয়, কেননা নবুওয়াত ও ইমামত সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর অসীম জ্ঞানের মাধ্যমে যাদেরকে এ মর্যাদার যোগ্য মনে করেন কেবলমাত্র তাদেরকেই তা দান করেন। আল্লাহ্ তায়ালা যদি মানুষের কল্যাণের জন্য কোন শিশুকেও সম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন তাতে কোন সম ার অবকাশ থাকতে পারে না! কেননা আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।

সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা যোগ্য মনে করলে শিশুকালেই কাউকে নবী, আবার কাউকে উম্মতের জন্য ইমাম হিসাবে মনোনীত করতে পারেন।

ইমাম জাওয়াদ (আ.) যখন ইমামত প্রাপ্ত হন তখন তাঁর বয়স মাত্র নয় বছর। মুয়াল্লা ইবনে মুহাম্মদ বলেন : ইমাম রেজা (আ.)- এর শাহাদতের পর ইমাম মুহাম্মদ তাকী (আ.)- এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। শিয়াদের কাছে বর্ণনা করার জন্য তাঁর শারীরিক অবয়ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলাম। এমতাবস্থায় ইমাম জাওয়াদ (আ.) বললেন : ‘হে মুয়াল্লা, মহান আল্লাহ ইমামতের ক্ষেত্রেও নবুওয়াতের ন্যায় দলিল পেশ করেছেন :

و اتيناه الحكم صبياً

আমরা (ইয়াহিয়াকে) বাল্যকালেই প্রজ্ঞা (নবুওয়াত) দান করেছিলাম। (এরশাদ, শেখ মুফিদ, পৃ. ৩০৬)

মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে আম্মার বলেন, দু ’ বছর যাবৎ আমি ইমাম রেজা (আ.)- এর চাচা আলী ইবনে জাফরের নিকটে যেতাম। তিনি তাঁর ভাই ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আ.)- এর কাছ থেকে যে সম হাদীস শুনতেন, তা আমার কাছে বর্ণনা করতেন, আর আমি তা লিখে রাখতাম।

একদা মসজিদে নববীতে একত্রে বসে ছিলাম, এমন সময় ইমাম জাওয়াদ (আ.) প্রবেশ করলেন। আলী ইবনে জাফর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানালেন এবং তাঁর হ মোবারকে চুম্বন করলেন। ইমাম জাওয়াদ (আ.) তাকে বললেন : দাদা বসুন, মহান আল্লাহ্ আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুন। তিনি বললেন : কিভাবে বসি হে আমার নেতা, আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে আমি বসতে পারি?

যখন আলী ইবনে জাফর নিজের স্থানে ফিরে আসলেন, সকলে তাকে তিরস্কার করে বলল, আপনি তাঁর দাদা, আর আপনি কিনা তাঁকে এভাবে সম্মান দেখালেন?

আলী ইবনে জাফর বললেন : চুপ করুন, আল্লাহ্ আমার মত পাকা দাড়িওয়ালাকে ইমামতের যোগ্য মনে করেন নি। অথচ এই বালককে ইমামতের যোগ্য মনে করেছেন এবং তাঁকে ইমাম বানিয়েছেন। তোমরা বলতে চাও আমি তাঁর মর্যাদাকে অস্বীকার করব? আমি তোমাদের এ সকল কথা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তাঁর গোলাম। (উসূলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২২)

ওমর ইবনে ফারাজ বলেন, ইমাম জাওয়াদের সাথে তাইগ্রীস নদীর তীরে দাঁড়িয়েছিলাম। তাঁকে বললাম : শিয়ারা দাবী করেন যে, আপনি তাইগ্রীস নদীর পানির ওজন বলে দিতে পারেন?

ইমাম জাওয়াদ (আ.) জবাব দিলেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আল্লাহ্ চাইলে একটা মশাকেও তাইগ্রীস নদীর পানির ওজনের সমপরিমাণ জ্ঞান দান করতে পারেন? আরজ করলাম, জী হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা পারেন । ইমাম বললেন, ‘আমি আল্লাহর নিকট মশা এবং অন্য সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়। (বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ১০০, উয়ুনুল মোজেযাহ, পৃ. ১১৩)

আলী ইবনে হাসানে ওয়াসেতী বলেন, ইমাম জাওয়াদ যেহেতু ছোট্ট ছিলেন, কিছু খেলনা তাঁর জন্য উপহার হিসাবে নিয়ে গেলাম। হযরতের কাছে পৌঁছে দেখলাম জনগণ প্রশ্ন করছে আর ইমাম জবাব দিচ্ছেন, প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলে সকলে চলে গেল। ইমামও উঠে যাচ্ছিলেন আমিও তার পিছু পিছু গেলাম। খাদেমের কাছে অনুমতি নিয়ে ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম।

সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন কিন্তু বেশ বিরক্ত বোধ করছিলেন এবং আমাকে বসতেও বললেন না। যাই হোক এগিয়ে গিয়ে খেলনাগুলো তাঁর সামনে রাখলাম, তিনি চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকালেন এবং খেলনাগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন :

‘ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাকে খেলা করার জন্য সৃষ্টি করেন নি! আমি খেলনা দিয়ে কি করব?’ আমি খেলনাগুলো গুটিয়ে নিলাম এবং ইমামের কাছে ক্ষমা চাইলাম। তিনি ক্ষমা করে দিলেন এবং আমি আমার কৃত কর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে ফিরে এলাম (দালায়েলুল ইমামাহ, পৃ. ২১২; বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ৫৯)।

ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর কিছু মুজিযাহ

ইমাম রেজা (আ.)- এর শাহাদতের পর আশি জন জ্ঞানী এবং ফকীহ বাগদাদ ও অন্যান্য শহর থেকে হজ্বব্রত পালন করার জন্য মক্কায় আসেন। মক্কা যাওয়ার পথে ইমাম জাওয়াদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তারা মদীনায় প্রবেশ করেন এবং ইমাম সাদিক (আ.)- এর বৈঠক খানা যেহেতু খালি ছিল সেখানে গেলেন। বালক ইমাম জাওয়াদ (আ.) তাদের মাঝে উপস্থিত হন। মুয়াফফাক নামে এক ব্যক্তি ইমামকে উপস্থিত সকলের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেন। সকলে ইমামের সম্মানে উঠে দাঁড়ান এবং সালাম বিনিময় করেন। অতঃপর তারা ইমামকে প্রশ্ন করলেন : ইমাম জাওয়াদ যথাযথ ভাবে তাদের প্রশ্নের জবাব দিলেন। সকলে এই মহামানবের মধ্যে ইমামতের নিদর্শন স্পষ্ট দেখতে ফেলেন এবং তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো। তারা খুব খুশী হলেন এবং ইমামের প্রশংসা ও তাঁর জন্য দোয়া করলেন ।

১. ইসহাক নামে এক ব্যক্তি বলেন, আমিও ইমামের কাছে প্রশ্ন করার জন্য একটি কাগজে দশটি প্রশ্ন লিখে রেখেছিলাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম যে, ইমাম যদি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন, তাহলে আমার জন্য দোয়া করার অনুরোধ জানাব। বলব আমার স্ত্রী অন্তসত্তা, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন ঐ সন্তান, পুত্র সন্তান হয়। সভা দীর্ঘায়িত হতে দেখে চিন্তা করলাম আজ না হয় থাক, কাল এসে প্রশ্নগুলি ইমামকে নিবেদন করব। ইমাম (আ.) আমাকে উঠতে দেখে বললেন, ‘হে ইসহাক, আল্লাহ্ আমার দোয়া কবুল করেছেন, তোমার একটি পুত্র সন্তান হবে, তার নাম রেখ আহমাদ। ’ আল্লাহর শোকর আদায় করে বললাম নিঃসন্দেহে ইনিই (ইমাম জাওয়াদ) হচ্ছেন পৃথিবীর বুকে আল্লাহর হুজ্জাত বা স্পষ্ট দলিল।

ইসহাক দেশে ফিরে গেল। আল্লাহ্ তাকে একটি সুন্দর পুত্র সন্তান দান করলেন। ইসহাক ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর নির্দেশানুসারে ছেলেটির নাম আহমাদ রাখল। (উয়ুনুল মুজিযাত, পৃ. ১০৯)

২. ইমরান ইবনে মুহাম্মদ আশয়ারী বলেন, ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর নিকটে গেলাম। আমার কাজ শেষে ইমামকে বললাম : উম্মুল হাসান আপনাকে সালাম জানিয়েছে এবং তার কাফনের

জন্য আপনার একটা পোশাক চেয়েছে। ইমাম এরশাদ করলেন : তার জন্য এটার আর প্রয়োজন নেই।

আমি চলে গেলাম কিন্তু ইমামের এ কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না। দেশে ফিরে জানতে পারলাম যে, আমি ইমামের সান্নিধ্যে পৌঁছানোর ১৩- ১৪ দিন পূর্বেই উম্মুল হাসান মারা গিয়েছে।

৩. আহমদ ইবনে হাদীদ বলেন, আমরা একদল হজ্বব্রত পালন করতে মক্কায় যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে ডাকাতরা আমাদের পথ রোধ করে সম মালপত্র ছিনিয়ে নিয়ে গেল। মদীনায় পৌঁছে ইমাম জাওয়াদের সাথে সাক্ষাৎ করে, ঘটনা খুলে বললাম। ইমাম জাওয়াদ (আ.) আমাদেরকে টাকা- পয়সা ও পোশাক- পরিচ্ছদ দান করলেন এবং বললেন : তোমাদের যার যে পরিমাণ অর্থ ডাকাতি হয়েছে সকলে সে পরিমাণে এ থেকে ভাগ করে নাও। ভাগ করে দেখা গেল, ডাকাতরা যে পরিমাণ অর্থ আমাদের কাছ থেকে ডাকাতি করেছিল, ইমাম জাওয়াদ (আ.) ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ আমাদেরকে দান করেছিলেন, তা অপেক্ষা কমও নয় বা বেশিও নয় (বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ৪৩)।

৪. মুহাম্মদ ইবনে সাহল মী বলেন : মক্কায় সর্বস্ব হারিয়ে মদীনায় ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর নিকটে গেলাম। মনে করেছিলাম ইমামের কাছে পরিচ্ছদ প্রার্থনা করব কিন্তু তার পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমার আবেদন কাগজে লিখে জানাব এবং তাই করলাম। অতঃপর মসজিদে নববীতে গিয়ে স্থির করলাম দু ' রাকাত নামাজ পড়ব এবং শতবার আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করব। যদি আমার অন্তর চিঠিটা ইমামের কাছে দিতে বলে তবে তাই করব আর যদি অন্তর সায় না দেয় তবে ছিঁড়ে ফেলব। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। কিন্তু আমার অন্তর বলল চিঠিটা না দিতে। তাই চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলে মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। কিছুদুর না যেতেই দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি রুমালে মুড়িয়ে কিছু পোশাক নিয়ে কাফেলার মধ্যে আমাকে খুঁজছিল। আমার কাছে পৌঁছে পোশাকগুলো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার মাওলা (ইমাম জাওয়াদ) এ পরিচ্ছদগুলো তোমার জন্য পাঠিয়েছেন ' (খারায়েজে রাভান্দি, পৃ. ২৩৭; বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ৪৪)।

৫. বৃক্ষটি ফলবান হওয়া : মামুন, ইমাম জাওয়াদকে মদীনা থেকে বাগদাদে নিয়ে আসল এবং ইমামের সাথে তার কন্যাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করল। কিন্তু ইমাম বাগদাদে না থেকে স্ত্রীকে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসলেন।

ফেরার পথে জনগণ ইমামকে বিদায় জানাতে শহরের শেষ পর্যন্ত এসেছিল। মাগরিবের নামাজের সময় ইমাম এক মহল্লায় পৌঁছান, সেখানে একটি পুরাতন মসজিদ ছিল। নামাজ পড়ার জন্য তিনি সেখানে গেলেন। মসজিদের আি নায় একটি ল গাছ ছিল কিন্তু তাতে কখনো ফল হতো না। ইমাম জাওয়াদ ওজুর পানি চাইলেন এবং ঐ বৃক্ষের গোড়ায় ওজু করলেন। জামায়াতবদ্ধভাবে হয়ে নামাজ পড়েলেন। অতঃপর চার রাকাত নফল নামাজ পড়ে সেজদাবনত হয়ে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। অতঃপর জনগণের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পরের দিন সকালে দেখা গেল গাছটিতে ফুল ধরেছে এবং কিছুদিন পর গাছটি ফলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। জনগণ এ দৃশ্য দেখে খুবই আশ্চর্যান্বিত হলো (নূরুল আবসার শাবলানজী, পৃ. ১৭৯; ইহকা ল হাক, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৪২৪)। শেখ মুফিদ ও এ গাছটি দেখে ছিলেন এবং তার ফলও খেয়েছিলেন।

ইমাম রেজা (আ.)- এর শাহাদতের সংবাদ

উমাইয়া ইবনে আলী বলেন, যখন ইমাম রেজা (আ.) খোরাসানে ছিলেন, আমি তখন মদীনায় ছিলাম এবং ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর সাথে যোগাযোগ রাখতাম। ইমামের আত্মীয়- স্বজনরা প্রায়ই তার সাথে সালাম বিনিময় করতে আসতেন। একদিন তাঁর দাসীকে বললেন, তাদেরকে (আত্মীয়- স্বজন) শোক পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে বল। পরের দিন আবারও তাদেরকে শোক পালনের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। তারা (আত্মীয়- স্বজনরা) বললেন : কার জন্যে শোক পালন করতে? ইমাম জাওয়াদ (আ.) বললেন : 'সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের (ইমাম রেযা) জন্যে শোক পালন করতে। '

কিছুদিন পর ইমাম রেজা (আ.)- এর শাহাদতের খবর পাওয়া গেল এবং জানা গেল যেদিন ইমাম জাওয়াদ (আ.) বলেছিলেন, 'শোক পালনের জন্য প্রস্তুত থাক ' ঠিক সেই দিনই ইমাম রেযা (আ.) খোরাসানে শহীদ হয়ে ছিলেন (আ ' লামুল ওয়ারা, পৃ.৩৩৪)।

১. কাজীর স্বীকারোক্তি: কাজী ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম নবী পরিবারের ঘোর শত্রু ছিল। সে নিজেই স্বীকার করে যে, একদা মসজিদে নববীতে ইমাম জাওয়াদকে দেখলাম। তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক করলাম তিনি সব বিষয়ের যথাযথ জবাব দিয়ে আমাকে তুষ্ট করলেন। বললাম একটি ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করব কিন্তু লজ্জা পাচ্ছি কিভাবে তা করব। ইমাম জাওয়াদ (আ.) বললেন : তোমার প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই, আমিই বলে দিচ্ছি তুমি কি প্রশ্ন করতে চাও! তুমি প্রশ্ন করতে চাও যে বর্তমানে ইমাম কে?

বললাম, জী হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, আল্লাহর কসম, আমি এ প্রশ্নই আপনার কাছে করতে চেয়েছিলাম। ইমাম জাওয়াদ (আ.) বললেন : আমিই বর্তমান যুগের ইমাম। বললাম : তার প্রমাণ কী? এমন সময় ইমামের হাতে যে লাঠিটি ছিল তা মুখ খুলল এবং বলল : ইনিই হচ্ছেন আমার মাওলা এবং এই যুগের ইমাম ও আল্লাহর স্পষ্ট দলিল বা হুজ্জাত (উসূলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ৬৮)।

২. প্রতিবেশীর মুক্তি: আলী ইবনে জাবির বলেন, ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর নিকট ছিলাম। ইমামের একটি দুম্বা হারিয়ে যাওয়ায় জনগণ তাঁর এক প্রতিবেশীকে টেনে হেঁচড়ে ইমামের কাছে নিয়ে এল। ইমাম বললেন : 'তোমাদের কাণ্ড দেখে দুঃখ হয়! তাকে ছেড়ে দাও, সে দুম্বা চুরি করেনি। বর্তমানে দুম্বাটি অমুকের বাড়িতে আছে যাও, ওটাকে নিয়ে এস।

ইমাম যার কথা বলেছিলেন ঠিক সে বাড়িতেই দুম্বাটি পাওয়া গেল। ইমাম কর্তৃক আদিষ্টরা বাড়ীর মালিককে চুরির দায়ে মার- ধোর করল এবং তার জামা কাপড় ছিড়ে ফেলল। কিন্তু বাড়ীওয়ালা শপথ করে বলল যে, সে দুম্বা চুরি করেনি। তাকে ইমামের কাছে ধরে আনল। ইমাম বললেন : তোমাদের জন্য আফসোস হয়! তোমরা ঐ ব্যক্তির উপর অত্যাচার করেছ। দুম্বাটি নিজেই ঐ ব্যক্তির ঘরে ঢুকে পড়ে এবং সে খবরই জানত না।

ফলে ইমাম ঐ ব্যক্তিকে তুষ্ট করার জন্য এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাকে কিছু স্বর্ণ মুদ্রা দান করলেন (বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ৪৭)।

৩. কারাবন্দীর নিস্কৃতি: আলী ইবনে খালেদ বলেন : খবর পেলাম এক ব্যক্তিকে মদীনা থেকে ধরে এনে সামাররাতে কারাবন্দী করা হয়েছে। বলছে ঐ ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করেছে।

জেলখানায় গিয়ে তার সাথে দেখা করলাম এবং তাকে একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তি বলে মনে হলো। তার কাছে কারারুদ্ধ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। বলল, সাইয়্যেদুশ শোহাদা হযরত ইমাম হুসাইনের মাথা মোবারক দাফন করা আছে বলে কথিত শামের ঐ স্থানে ইবাদত করছিলাম।[৩] এক রাত্রে বিশেষ ভাবে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তিকে আমার সামনে দেখতে পেলাম; তিনি আমাকে বললেন : ওঠো।

আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং তার সাথে কিছু দূর যাওয়ার পর দেখলাম ফার মসজিদে অবস্থান করছি। প্রশ্ন করলেন : এটা কোন মসজিদ, জান কি? বললাম : জী হ্যাঁ, এটা ফার মসজিদ।সেখানে নামাজ পড়ে বাইরে এলাম। পুনরায় কিছু দূর চলার পর দেখলাম মদীনায় মসজিদে নববীতে অবস্থান করছি। রাসূল (সা.)- এর মাজার জিয়ারত করে এবং মসজিদে নামাজ পড়ে বাইরে এলাম। আরো কিছু দূর গিয়ে দেখলাম মক্কায় আল্লাহর ঘরে অবস্থান করছি।

তাওয়াফ করে বাইরে এলাম এবং কিছু পথ চলার পর দেখলাম শামে যেখানে ছিলাম সেখানেই পৌঁছে গিয়েছি। আর তখন ঐ মহান ব্যক্তি আমার চোখের আড়াল হয়ে গেলেন।

এই অলৌকিক ঘটনা আমার জন্য খুবই আশ্চর্যজনক ছিল। এভাবে এক বছর কেটে যাওয়ার পর পুনরায় ঐ মহান ব্যক্তির আগমন ঘটে এবং এক বছর পূর্বে যা ঘটেছিল ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল কিন্তু এবার যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাঁকে কসম দিয়ে তাঁর পরিচয় দিতে বললাম। তিনি বললেন, 'আমি মুহম্মদ ইবনে আলী ইবনে মূসা ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালীব ' (অর্থাৎ ইমাম জাওয়াদ)।

এ অলৌকিক ঘটনাকে কারো কারো কাছে বর্ণনা করলাম। এভাবে ঘটনাটি মো ' তাসেমের উজির মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালেক যিয়াতের কাছে পৌঁছে যায়। যিয়াত আমাকে বন্দী করে কারাগারে নেয়ার নির্দেশ দেয় এবং মিথ্যা প্রচার করে যে আমি নবুওয়াত দাবী করেছি।

আলী ইবনে খালেদ বলেন তাকে বললাম : তুমি কি চাও তোমার এ ঘটনাকে যিয়াতকে বি ারিত লিখে জানাব। আর এভাবে যদি সে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে তাহলে জ্ঞাত হবে। বলল : লিখুন।

ঘটনাটি যিয়াতের কাছে বি ারিত লিখলাম। যিয়াত ঐ পত্রের অপর পিঠে জবাব লিখে পাঠাল, তাকে বল : যে ব্যক্তি তাকে এক রাত্রে কয়েক ঘন্টার মধ্যে শাম থেকে ফা, ফা থেকে মদীনা, মদীনা থেকে মক্কায় এ সুদীর্ঘ পথ ভ্রমন করিয়েছেন আবার ফিরিয়ে এনেছেন তাকেই মুক্তি দিতে।

যিয়াতের এ জবাবে দুঃখিত হলাম। পরের দিন চিঠির জবাব জানাতে এবং সান্ত্বনা দিতে জেলখানায় গেলাম কিন্তু দেখলাম যে, জেলার ও প্রহরীরা অস্থির এবং বিচলিত। জানতে চাইলাম, কী হয়েছে?

বলল : যে লোকটি নবুওয়াত দাবী করেছিল, সে গত রাতে জেল থেকে পালিয়েছে কিন্তু জানিনা কিভাবে সে পালাতে সক্ষম হলো? মাটির নীচে চলে গিয়েছে না আকাশে উড়ে গেছে? অনেক খোঁজা- খোঁজি করেও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।[৪]

৪. ইমাম রেযা (আ.)- এর নিকটতম ব্যক্তি, আবা সালত হারুভীকে ইমামের শাহাদতের পর মামুনের নির্দেশে কারাবন্দী করা হয়েছিল। তিনি বলেন :

এক বছর জেলে থাকার পর হতাশায় পড়লাম। রাত্র জেগে ইবাদত বন্দেগী করতে লাগলাম এবং রাসূল (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতকে আমার শাফায়াতকারী হিসাবে প্রার্থনা করলাম। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে মুক্তি প্রার্থনা করলাম। দোয়া শেষ না হতেই ইমাম জাওয়াদকে জেলখানায় আমার সামনে দেখতে পেলাম।

তিনি বললেন : এই আবা সালত, তুমি কি অসহায় হয়ে পড়েছ? সবিনয়ে নিবেদন করলাম : হ্যাঁ আমার নেতা, আল্লাহর শপথ! আমি অসহায় হয়ে পড়েছি।

ইমাম বললেন : ওঠো। অতঃপর তিনি শিকলে হাত দিলে বন্ধন খুলে গেল এবং আমার হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলেন। প্রহরীরা আমাকে দেখতে পেল কিন্তু ইমামের অলৌকিক ক্ষমতা ও বিরাট ভাবমূর্তি দেখে তারা কিছুই বলতে সাহস করল না। অতঃপর ইমাম বললেন : 'চলে যাও, আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করবেন, এরপর থেকে কখনোই তুমি মামুনকে দেখতে পাবে না; আর মামুন ও তোমাকে দেখতে পাবে না। ' ইমাম যা বলেছিলেন ঠিক তাই হয়েছিল।[৫]

৫. মো ' তাসেম আব্বাসীর সভায় : ইবনে আবু দাউদের বন্ধু যারকান বলেন, একদা দাউদ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মো ' তাসেমের সভা হতে ফিরছিল। কারণ জানতে চাইলে বলল : অদ্য আমার মনে হচ্ছিল হায়! যদি বিশ বছর পূর্বে মারা যেতাম? প্রশ্ন করলাম : কেন? বলল : মো ' তাসেমের সভায় আবু জাফর (ইমাম জাওয়াদ) যেভাবে আমাকে পোকাত করল সে কারণে। বললাম : ঘটনাটা কী?

বলল : এক ব্যক্তি চুরি করে তা স্বীকার করেছিল; ফলে সে মো ' তাসেমের কাছে তার উপর আল্লাহর হু ম জারী করে তাকে পবিত্র করার অনুরোধ করল। খলিফা সকল দরবারি ফকীহদেরকে একত্র করল এবং মুহাম্মদ ইবনে আলী ইমাম জাওয়াদকেও ডেকে পাঠাল। আমাদেরকে প্রশ্ন করল : চোরের হাত, কোথা থেকে কাটতে হবে?

আমি (দাউদ) বললাম : হাতের কব্জি থেকে।

বলল : তার দলিল কি?

বললাম : কেননা তায়াম্মুমের আয়াতে হাত বলতে হাতের কব্জি পর্যন্ত বুঝানো হয়েছে।

(فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ)

অর্থাৎ তোমরা যদি পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর এবং তোমাদের মুখ মন্ডল ও হ দ্বয়কে মাছেহ কর (মুছিয়া ফেল)। (সূরা নিসা : ৪৩)

কিছু সংখ্যক ফকীহ আমার এ যুক্তির সমর্থন করলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক বললেন, না, কনুই পর্যন্ত কাটতে হবে। মো ' তাসেম বলল তার দলিল কি? তারা বলল : ওজুর আয়াতে হাত বলতে হাতের কনুই পর্যন্ত বোঝান হয়েছে।

(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)

অর্থাৎ তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হ সমূহকে কনুই পর্যন্ত ধৌত কর (সূরা মায়িদাহ : ৬)।

অতঃপর মো ' তাসেম মুহাম্মদ ইবনে আলী ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর কাছে জিজ্ঞাসা করল : এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

ইমাম বললেন : এরাতো বললই, আমি আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। মো ' তাসেম পীড়াপীড়ি করতে লাগল এবং কসম খেল অবশ্যই আপনাকে মতামত দিতে হবে।

মুহাম্মদ ইবনে আলী আল জাওয়াদ (আ.) বললেন : যেহেতু কসম খেয়েছ তাই আমার মতামত বলছি। এরা সকলেই ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছে কেননা চোরের শুধুমাত্র আ ুল কাটা যাবে, আর সম হাত অবশিষ্ট থাকবে।

মো ' তাসেম বলল : তার দলিল কী?

ইমাম জাওয়াদ (আ.) বললেন : যেহেতু রাসূল (সা.) বলেছেন, যুগপৎভাবে সাতটি অে র মাধ্যমে সিজদা সম্পাদিত হয়- কপাল, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং পায়ের দুই বৃদ্ধাংগুলি। সুতরাং যদি চোরের হাতের কব্জি অথবা কনুই থেকে কেটে ফেলা হয় তাহলে সিজদার জন্য হাতই অবশিষ্ট থাকে না। এ ছাড়াও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন :

(وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا)

অর্থাৎ এবং নিশ্চয় সকল মসজিদ (সাতটি অ যার উপর সিজদা ওয়াজেব)[৬] আল্লাহর জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সে অন্য কাহাকেও (মা ’ বুদরূপে) ডাকিও না (সূরা জিন : ১৮)। ”

সুতরাং যা আল্লাহর জন্য তা কাটা যাবে না।

ইবনে আবি দাউদ বলে : মো ’ তাসেম ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর দলিলকে যুক্তিযুক্ত মনে করে তা গ্রহণ করেছিল। আর সে মোতাবেক চোরের আ ুল কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়। আমরা যারা ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম, উপস্থিত জনগণের সামনে অপমানিত হলাম। আর আমি এতই লজ্জিত হয়েছিলাম যে, সেখাইে নিজের মৃত্যু কামনা করি (তাফসীরে আইয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৯, বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ৫)।

ষড়যন্ত্রমূলক বিয়ে

ইমাম রেজা (আ.)- এর জীবন যাপন বিশ্লেষন করতে গিয়ে যেমনটি বলা হয়েছে, মামুন আব্বাসী সমাজের বিশৃঙ্খলা ও আলাভীদের বিদ্রোহ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজেকে রাসূল (সা.)- এর আহলে বাইতের ভক্ত হিসাবে অভিহিত করত। এ প্রচেষ্টাকে বা বায়িত করার জন্যে সে ইমাম রেযা (আ.)- এর উপর ওয়ালী আহাদের পদ চাপিয়ে দিয়েছিল এবং এর মাধ্যমে ইমামকে নিকট থেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালিয়েছিল।

অপর দিকে বনী আব্বাসেরা মামুনের এ পদ্ধতিতে বিশেষ ভাবে নারাজ এবং রাগান্বিত হয়। কেননা তারা মনে করেছিল, এভাবে খেলাফত বনী আব্বাসদের কাছ থেকে বনি হাশিমদের কাছে হ ান্তরিত হয়ে যাবে। ইমাম রেযা (আ.) যখন মামুনের মাধ্যমে বিষাক্রান্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন, বনি আব্বাস খুশী হয়ে মামুনের দিকে প্রত্যাবর্তন করল।

মামুন একান্ত গোপনে ইমাম রেজা (আ.)- কে বিষ প্রয়োগ করে শহীদ করেছিল। সে সমাজকে তার এ জঘন্য পাপ থেকে অজ্ঞাত রাখতে চেয়েছিল এবং তার এ পাপকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বাহ্যিক ভাবে দুঃখ ও শোক পালন করেছিল। এমনকি তিন দিন যাবৎ সে ইমাম রেজা (আ.)- এর রওজা মোবারকে অবস্থান করে এবং রুটি ও লবণ খেয়ে থাকে। এভাবে শিয়াদের সামনে নিজেকে শোকার্ত হিসাবে উপস্থাপন করে।

কিন্তু এতসব ভন্ডামি ও গোপনীয়তা রক্ষা করা সত্ত্বেও আলী বংশীয়দের বুঝতে বাকী রইল না যে, ইমামের হন্তা স্বয়ং মামুন ছাড়া আর কেউ নয়। সেহেতু তারা নিদারুনভাবে দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। মামুন দেখল তার হু মত পুনরায় বিপদের সম্মুখীন। তাই উপায় অন্বেষণের জন্য এবং প্রতিকারক হিসাবে এক নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করল। সে দেখাতে চাইল যে আমি ইমাম জাওয়াদকে অত্যন্ত ভালবাসি এবং অধিক সুযোগ লাভের আশায় তার কন্যাকে ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর সাথে বিবাহ দেয়। ইমাম রেজাকে যুবরাজের পদ দিয়ে যা হাসিল করতে চেয়েছিল এ বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছিল।

স ত কারণেই মামুন ২০৪ হিজরীতে অর্থাৎ ইমাম রেজা (আ.)- এর শাহাদতের এক বছর পর ইমাম জাওয়াদ (আ.)- কে মদীনা থেকে বাগদাদ নিয়ে আসে এবং তার কন্যা উম্মুল ফাযলকে ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে।

রিয়ান ইবনে শাবিব বলেন : বনী আব্বাসরা যখন শুনতে পেল যে মামুন তার কন্যাকে ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর সাথে বিবহ দিতে চায়, তখন তারা ভয় পেয়ে গেল। তারা মনে করতে লাগল খোদা না করুন, হু মত আব্বাসীয়দের হাতছাড়া হয়ে যায়! এ কারণে তারা মামুনের কাছে গেল এবং প্রতিবাদ করে বলল : আপনি এ সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করুন। আপনি তো জানেন আমাদের সাথে আলী বংশীয়দের কী ঘটেছে? পূর্ববর্তী খলিফারা আলী বংশীয়দেরকে তাচ্ছিল্য করত এবং নির্বাসন দিত।

ইতোপূর্বে যখন ইমাম রেজা (আ.)- কে যুবরাজের পদে অধিষ্টিত করেছিলেন দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কিন্তু সে সম ার সমাধান হয়ে গিয়েছে। এখন আপনার কসম খেয়ে বলছি, এ বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় আমাদেরকে দুঃখিত করবেন না, এ বিবাহ থেকে বিরত থা ন। আপনার কন্যাকে আব্বাসীয়দের মধ্য থেকে যে আপনার কন্যার যোগ্য তার সাথে বিবাহ দিন।

মামুন জবাব দিল তোমাদের এবং আলী বংশীয় মধ্যে যা ঘটেছে তার জন্যে তোমরাই দায়ী। যদি সুবিচার (ন্যায় বিচার) কর, তাহলে বুঝবে তারা তোমাদের থেকে উত্তম। আমার পূর্ববর্তী খলিফারা যা করেছে তা ছিল আত্মীয়তার সম্পর্ককে ছিন্ন করা। আর আমি ইহা থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছি। ইমাম রেযা (আ.)- কে যুবরাজ করাতেও আমি অনুতপ্ত নই। আমি তাঁকে খেলাফত দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। অবশেষে নিয়তি যা ছিল তাই ঘটে গেল। আর আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী আল জাওয়াদকে এ কারণে আমার মেয়েকে তাঁর সাথে বিবাহের জন্য নির্বাচন করেছি যে, তিনি এত কম বয়সেই সম জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং এটাই বিস্ময় ও আশ্চর্যের কারণ। এ বিষয়টি আমার জন্য স্পষ্ট, আশা করি সর্ব রের জনগণের জন্যও তা স্পষ্ট হবে। যার মাধ্যমে তারা বুঝবে যে আমার সিদ্ধান্তই সঠিক এবং তিনিই (ইমাম জাওয়াদ) আমার কন্যার সহধর্মী হওয়ার একান্ত যোগ্য।

আব্বাসীয়রা বলল : যদিও এ বালক আপনার বিস্ময় ও আশ্চর্যের কারণ হয়েছে কিন্তু সে এখনও বাচ্চা, পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন করেনি। অপেক্ষা করুন ততক্ষণে সে পর্যাপ্ত সাহিত্য ও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করুক। অতঃপর আপনার ইচ্ছা বা বায়িত করেন।

মামুন বলল : তোমাদের প্রতি আফসোস হয় এ যুবককে আমি তোমাদের চেয়ে ভাল চিনি। তিনি এমন পরিবারের যাদের জ্ঞান আল্লাহ্ প্রদত্ত এবং তাদের অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। তাঁর মহান পিতারা সর্বদাই ইসলামী জ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও সবার শীর্ষে ছিলেন। তারপরও যদি আগ্রহী হও তাহলে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে পারো, এর মাধ্যমে আমি যা বলেছি তা তোমাদের জন্য স্পষ্ট হবে।

তারা বলল : এ প্র াবটি ভাল, আমরা তাকে পরীক্ষা করে দেখব এবং আপনার সামনেই তাঁর কাছে ফেকাহ শাস্ত্র (ইসলামী মাসলা মাসায়েল) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। যদি ঠিকমত উত্তর দেয় তাহলে আমাদের আর কোন আপত্তি থাকবে না। আর এভাবে সবার কাছে আপনার সঠিক সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি আমাদের প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিতে না পারেন, সে ক্ষেত্রেও আমাদের সম ার সমাধান হয়ে যাবে এবং আপনি বিবাহের এ সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করবেন।

মামুন বলল : যখন ইচ্ছা তাকে পরীক্ষা করতে পারো।

আব্বাসীয়রা কাজী ইয়াহিয়া ইবনে আকসামের কাছে গেল এবং তাকে বলল তোমাকে বিরাট অংকের টাকা দেয়া হবে এ শর্তে যে, ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর কাছে এমন প্রশ্ন করতে হবে যেন তিনি তার জবাব না দিতে পারেন। ইয়াহিয়া এ শর্তে রাজি হলো। অতঃপর তারা মামুনের কাছে গিয়ে একটি দিন ধার্য করল। নির্দিষ্ট দিনে সকলে সমবেত হলো। মামুনের নির্দেশে ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর জন্য মঞ্চ তৈরী হলো। ইমাম জাওয়াদ (আ.) প্রবেশ করলেন এবং নির্ধারিত মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে বসল এবং ইয়াহিয়া ইমামের মুখোমুখি বসল। মামুন ও ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর পাশে গিয়ে বসল।

ইয়াহিয়া মামুনকে বলল : অনুমতি দিলে আবু জাফর (আ.)- এর কাছে প্রশ্ন করতে পারি? মামুন বলল : স্বয়ং তাঁর কাছেই অনুমতি চাও! ইয়াহিয়া ইমামকে বলল : অনুমতি দিলে আপনার কাছে প্রশ্ন করতে পারি।

ইমাম জাওয়াদ (আ.) বললেন : যদি চাও প্রশ্ন কর!

ইয়াহিয়া বলল : যদি কোন ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় শিকার করে শরীয়তে তার হু ম কী?

ইমাম জাওয়াদ (আ.) বললেন : এ মাসয়ালার বিভিন্ন রূপ রয়েছে। সে কি "মাসজিদুল হারামে" বাইরে ছিল না মধ্যে। সে কি জানত যে, এ কাজ হারাম, না জানত না। ইচ্ছাকৃত ভাবে শিকার করেছে, না অসাবধানতা বসত। সে কি গোলাম ছিল, না স্বাধীন। বালক ছিল, না বয়স্ক। এটা কি তার প্রথম শিকার ছিল, না দ্বিতীয়। শিকার পাখি ছিল, না পশু বা অন্যকিছু। শিকার ছোট্ট ছিল, না বড়। শিকারী কি তার এ কাজের জন্য অনুতপ্ত, না আবারও তা করতে চায়। রাত্রে শিকার করেছে, না দিনে। তার ইহরাম কি ওমরার ইহরাম ছিল, না হজের ইহরাম।

ইমাম জাওয়াদ (আ.) তখন মাত্র নয়- দশ বছরের বালক। ইমাম (আ.) মূল প্রশ্নটিকে যখন এমন বিচক্ষণতার সাথে ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করলেন, ইয়াহিয়া হতবাক হয়ে গেল। তার চেহারায় পরাজয় এবং অক্ষমতার চিহ্ন স্পষ্ট দৃশ্যমান হলো এবং সে তোতলিয়ে কথা বলতে লাগল। এভাবে উপস্থিত সকলের কাছে ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর বিচক্ষণতা ও জ্ঞান ক্ষমতা এবং ইয়াহিয়ার অজ্ঞতা ও পরাজয় সুস্পষ্ট হলো।

মামুন বলল : এ বিশেষ নেয়ামতের (ইমাম জাওয়াদের) জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করছি, আমি যা মনে করেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে।

অতঃপর আব্বাসীয়দের দিকে মুখ করে বলল : যা তোমরা অস্বীকার করছিলে এখন তার প্রমাণ পেয়েছ তো?

ইহরামের বিভিন্ন অবস্থায় শিকারের হুকুম নিম্নরূপ

মামুন ইমাম জাওয়াদকে অনুরোধ করল ইহরামের বিভিন্ন অবস্থায় (যা আপনি উপস্থাপন করেছেন) শিকারের যদি বর্ণনা করেন তাহলে বাধিত হব। ইমাম জাওয়াদ (আ.) বললেন :

হ্যাঁ, যদি মোহরেম (যে ইহরাম বেঁধেছে) হিল্লাতে (হারামের বাইরে) শিকার করে থাকে, আর শিকার যদি বড় পাখি হয়, তার কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) একটি দুম্বা। আর যদি হারামের মধ্যে শিকার করে থাকে কাফফারা দ্বিগুণ হবে অর্থাৎ দু ' টি দুম্বা। শিকার যদি পাখির বাচ্চা হয় আর তা হারামের বাইরে হয়ে থাকে কাফফারা একটি ভেড়ার বাচ্চা। আর যদি হারামের মধ্যে শিকার করে থাকে তাহলে কাফফারা একটি ভেড়ার বাচ্চা ও ঐ পাখির বাচ্চার যে দাম হয় তা। যদি বন্য পশু হয় যেমন জেব্রা তার কাফফারা একটি গরু। আর যদি উট পাখি হয় তার কাফফারা একটি উট। হরিণ হলে তার কাফফারা একটি দুম্বা। আর এ শিকারগুলো যদি হারামের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে কাফফারা দ্বিগুণ হবে।

ইহরাম যদি হজের হয় তাহলে কাফফারার ঐ পশুকে 'মিনায় ' কোরবানী করবে। আর যদি ওমরার ইহরাম হয় তাহলে মক্কায় কোরবানী করবে। উল্লেখ্য যে জ্ঞানী ও মূর্খের (ফতোয়া সম্পর্কে অনবহিত) কাফফারা সমান। ইচ্ছাকৃত ভাবে শিকার করলে সে গোনাহ করেছে এবং তাকে কাফফারা দিতে হবে। অসাবধানতা বসত করে থাকলে সে গোনাহ করেনি তবে তাকে কাফফারা দিতে হবে। স্বাধীন হলে নিজেকেই ঐ কাফফারা দিতে হবে। দাস হলে তার মনিবকে ঐ কাফফারা দিতে হবে। বয়স্কের জন্য কাফফারা ওয়াজিব। বালকের জন্য কাফফারা ওয়াজিব নয়। শিকারী যদি তার এ কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় তাহলে তার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু যে অনুতপ্ত নয়, সে শাি পাবে।

মামুন ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর মনোরম জবাব শুনে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করল এবং ইয়াহিয়া ইবনে আকসামকে প্রশ্ন করার অনুরোধ জানাল। ইমাম জাওয়াদ (আ.) ইয়াহিয়াকে বলল, এখন আমি তোমাকে প্রশ্ন করব?

ইয়াহিয়া যেহেতু পূর্বেই ইমামের জ্ঞানের কাছে পরাজয় বরণ করেছিল নিচু স্বরে বলল : আপনার ইচ্ছা, যদি পারি তাহলে জবাব দিব, আর তা না হলে আপনার কাছ থেকে শিখে নিব।

ইমাম জাওয়াদ (আ.) বললেন : বলত দেখি, কিরূপে স ব যে, একটি লোক সকালে যখন একটি মহিলার দিকে তাকাল তা ছিল হারাম। পূর্বাহ্নে ঐ মহিলা তার জন্য হালাল হয়ে গেল। জোহরের (দুপুরের) সময় হারাম হয়ে গেল। আসরের (বিকালে) সময় আবার হালাল হয়ে গেল। সন্ধ্যায় আবার হারাম হলো। রাত্রে এশার নামাজের সময় পুনরায় হালাল হলো। মধ্য রাত্রে আবার হারাম হয়ে গেল। সকালে আবার তার জন্য হালাল হয়ে গেল। কেন এরূপ হয়েছিল এবং কী কারণে একবার তার জন্য হালাল হচ্ছিল , আবার হারাম হয়ে যাচ্ছিল?

ইয়াহিয়া বলল, আল্লাহর শপথ! আমি এর উত্তর জানি না এবং জানি না কোন কারণে এরূপ হচ্ছিল। দয়া করে আপনি যদি এর জবাব বলে দেন, তাহলে বাধিত হব।

ইমাম জাওয়াদ (আ.) বললেন : ঐ মহিলাটি এক লোকের দাসী ছিল। ঐ নামাহরাম লোকটি তার দিকে তাকাল এবং সে দৃষ্টি তার জন্য হারাম ছিল। পূর্বাহ্নে লোকটি ঐ দাসীকে তার মনিবের কাছ থেকে কিনে নেয় এবং তার জন্য হালাল হয়ে যায়। দুপুরে ঐ দাসীকে মুক্ত করে দিল এবং তার জন্য হারাম হয়ে গেল। আসরের সময় তার সাথে বিবাহ করল এবং তার জন্য হালাল হয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় 'যিহার ' [৭] করল এবং তার জন্য হারাম হয়ে গেল। রাত্রে এশার নামাজের পূর্বে কাফফারা দিল এবং পুনরায় তার জন্য হালাল হয়ে গেল। মধ্যরাত্রে তাকে এক তালাক দিল এবং তার জন্য হারাম হয়ে গেল। সকালে প্রত্যাবর্তন করল এবং পুনরায় তার জন্য হালাল হয়ে গেল।

মামুন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার আত্মীয়- স্বজনদের দিকে তাকাল এবং বলল : তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে এভাবে প্রশ্ন করতে পারে ও তার চমৎকার জবাব দিতে পারে? সকলে বলল : আল্লাহর কসম! আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অপারগ ও অক্ষম।[৮]

ঐ বৈঠকেই মামুন ইমাম জাওয়াদকে তার (মামুনের) কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্র াব দেয় এবং ইমামকেই বিবাহের খোৎবা পাঠ করার অনুরোধ জানায়। ইমাম জাওয়াদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মামুনের এ প্র াব গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং খোৎবাটি এভাবে শুরু করেন :

الحمد لله اقراراً بنعمته ولا اله الاالله اخلاصاً لوحدانيته و صلى الله على محمّدٍ سيِّد بريته والاصفياء من عترته اما بعد فقد كان من فضل الله على الانام ان اغناهم بالحلال عن الحرام و قال سبحانه : انكحوا الايامي منك والصّالحين من عبادكم وامائكم اِن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسعٌ عليمٌ

অর্থাৎ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁর অসংখ্য নেয়ামতের জন্য। তাঁর একত্ববাদের স্বীকারান্তে ঐকান্তিকতার সাথে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাহ পাঠ করছি। আল্লাহর দরুদ বর্ষিত হোক সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর মনোনীত এবং পবিত্র আহলে বাইতের উপর। নিঃসন্দেহে এটা মানুষের প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত যে, তিনি তাদেরকে হালালের মাধ্যমে হারামের অমুখাপেক্ষী করেছেন এবং বিবাহের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন : "এবং তোমাদের মধ্যে অবিবাহিতদের ও তোমাদের দাস- দাসীগণের মধ্যে যারা সৎ, তোমরা তাদের বিবাহ প্রদান কর। যদি তারা অভাবগ্র — হয়, তা হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাদেরকে সচ্ছল করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রাচুর্যের অধিকারী এবং সর্বজ্ঞানী। "

অতঃপর ইমাম জাওয়াদ (আ.) হযরত ফাতেমা যাহরা (আ.)- এর দেনমোহরের অনুরূপ (পাঁচশত দেরহাম) দেনমোহর ধার্য করে মামুনের কন্যাকে বিবাহ করার সম্মতি জানান। মামুন তার কন্যার পক্ষ থেকে বিবাহের আকদ পড়ে এবং ইমাম জাওয়াদ (আ.) কবুল করেন। অতঃপর মামুনের নির্দেশে উপস্থিত সকলকে পুরস্কৃত করা হয় এবং বিশাল ভোজনেরও আয়োজন হয়।

অবশ্যই লক্ষণীয় যে, মামুনের এসকল বন্ধুত্বের ভান এবং ভণ্ডামী আর এই বিবাহ শুধুমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য- উে শ্য হাসিলের জন্যই। আর এটা বুঝে নেওয়া স ব যে, মামুন এ বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে বিশেষ করে কয়েকটি উে শ্য হাসিল করার চেষ্টায় ছিল।

১. নিজ কন্যাকে ইমাম জাওয়াদের ঘরে পাঠিয়ে তাঁকে সর্বক্ষণের জন্য সূক্ষ্মভাবে নিজের নখদর্পনে রাখা এবং তার কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা। মামুনের কন্যাও যে যথারীতি এ গুপ্তচরের দায়িত্ব খুব ভাল ভাবেই সম্পাদন করত ইতিহাস তার চরম সাক্ষী।

২. এ বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে ইমামকে তার আনন্দ- ফূর্তিতে পূর্ণ দরবারের সাথে জড়িত করা এবং খেলাধূলা, বিলাসিতা ও পাপাচারিতার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া। আর এর মাধ্যমে ইমামের

মহত্ত্ব ও মর্যাদার উপর আঘাত হানা। তাছাড়া ইমামকে জনসমক্ষে তাঁর ইসমাত (নিষ্পাপত্বের) ও ইমামতের সমুন্নত মর্যাদা থেকে অবনমিত, লাঞ্ছিত এবং ঘৃণ্য করা।

মুহাম্মদ ইবনে রিয়ান বলেন : মামুন ইমামকে বিলাসিতার দিকে প্ররোচিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করত কিন্তু কখনই সফল হয়নি। ইমামের বিবাহ উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, মামুন একশত কানিজকে বাধ্য করল যে, যখন ইমাম জাওয়াদ (আ.) আসন গ্রহণ করবেন, তোমরা তাকে অভিনন্দন জানাতে যাবে। সুন্দরী কানিজরা তাই করল কিন্তু ইমাম তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপই করলেন না এবং কার্যত বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি তাদের এ সকল অপকর্ম থেকে খুবই অসন্তুষ্ট।

একই অনুষ্ঠানে মামুন এক নর্তককে গান বাজনা করার জন্যে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু নর্তক যখনই তার গান- বাজনা শুরু করল ইমাম জাওয়াদ (আ.) তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন : বেয়াদব 'আল্লাহকে ভয় কর ' । নর্তক ইমামের কড়া নির্দেশে (যা আধ্যাত্মিকতা ও খোদায়ী শক্তিতে পূর্ণ ছিল) এতই ভয় পেয়ে গেল যে বাদ্যযন্ত্রটি তার হাত থেকে পড়ে গেল এবং নর্তক তার শেষ জীবন পর্যন্ত ঐ হাত দিয়ে আর বাদ্য বাজাতে পারেনি। [৯]

৩. যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে এ বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে মামুন আলী বংশীয়দেরকে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা থেকে বিরত রাখা এবং নিজেকে তাদের ভক্ত ও অনুরাগী হিসেবে উপস্থাপন করাই ছিল মামুনের প্রধান লক্ষ্য।

৪. জনগণকে প্রবঞ্চণা করার জন্যে সে কখনো কখনো বলত : আমি এ কারণে এ বিবাহ সম্পন্ন করেছি যে, আবু জাফরের সন্তান আমার কন্যা গর্ভে ধারণ করবে। আর আমি এমন শিশুর নানা হবো যে হচ্ছে রাসূল (সা.) ও আলী (আ.)- এর বংশের।[১০] কিন্তু সৌভাগ্যবশত মামুনের এ প্রতারণাও নিস্ফল রইল। কেননা মামুনের কন্যার গর্ভে ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর কোন সন্তানই জন্ম গ্রহণ করেনি। ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর সন্তানরা (দশম ইমাম হযরত ইমাম হাদী সহ মূসা মোবারকা ' হুসাইন, ইমরান, ফাতেমা, খাদিজা, উম্মে লসুম, হাকিমাহ) সকলেই ইমামের অন্য স্ত্রী, সম্মানিতা ও আদর্শ দাসী 'সামানা মাগরেবিয়ার ' গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।[১১]

সব মিলিয়ে এ বিবাহ যার জন্যে মামুন উঠেপড়ে লেগেছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উ শ্যে ছিল। সুতরাং যদিও এ বিবাহ আড়ম্বরপূর্ণ ছিল কিন্তু ইমামের কাছে তার বিন্দুমাত্র মূল্য ছিল না। কেননা তিনিও তার মহান ও পুণ্যবান পূর্বপুরুষদের ন্যায় দুনিয়ার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করতেন না বরং নীতিগতভাবে মামুনের সাথে জীবন যাপন ইমামের জন্য চাপিয়ে দেওয়া এক কঠিন ভোগান্তি ছিল।

হুসাইন মাকারী বলেন : বাগদাদে গিয়ে ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হলাম। দেখলাম ইমাম জাওয়াদ (আ.) বেশ সাচ্ছন্দ্যে আছেন। মনে মনে ভাবলাম ইমাম যে প্রাচুর্যের মধ্যে আছেন , আর হয়ত নিজ বাসস্থান মদীনায় ফিরে আসবেন না। ইমাম জাওয়াদ ক্ষণিকের জন্যে অবনত ম কে থাকার পর যখন মাথা উঠিয়ে বসলেন তখন তাঁর চেহারা হলুদ হয়ে গিয়েছিল এবং ঐ অবস্থায় বললেন :

হে হুসাইন, আমাকে যে অবস্থায় (প্রাচুর্যের মধ্যে) দেখছ, তার চেয়ে রাসূল (সা.)- এর রওজার নিকট শুকনো রুটি আর লবণ ভক্ষণ আমার কাছে অধিক প্রিয়।*

সে কারণেই ইমাম জাওয়াদ (আ.) বাগদাদে না থেকে স্ত্রীকে (উম্মুল ফাযল) নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন এবং ২২০ হিজরি পর্যন্ত তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর সাথে মামুনের কন্যার বিবাহ হওয়ার পর ঐ জলসাতেই যেখানে ইমাম জাওয়াদ (আ.) মামুন, ইয়াহিয়া এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিল ইয়াহিয়া তাঁর কাছে প্রশ্ন করল : রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, জিব্রাইল (আ.) রাসূল (সা.)- এর উপর নাজিল হলেন এবং বললেন : হে মুহাম্মদ (সা.)! আল্লাহ্ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন "আমি আবু বকরের উপর সন্তুষ্ট, তাকে জিজ্ঞেস কর সেও কি আমার প্রতি সন্তুষ্ট? এ হাদীস সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?[১২]

ইমাম জাওয়াদ (আ.) বললেন : আমি আবু বকরের ব্যাপারে মন্তব্য করতে চাচ্ছি না। কিন্তু যে এই হাদীস বর্ণনা করেছে তাকে রাসূল (সা.)- এর বিদায় হজে পেশ কৃত হাদীসের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন : 'আমার প্রতি মিথ্যারোপ কারীদের সংখ্যা বহুগুণে

বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমার পরে এদের পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে তার স্থান হবে জাহান্নামের আগুনে। সুতরাং আমার নামে কোন হাদীস বর্ণিত হলে তা আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নতের সাথে মিলিয়ে দেখবে। যদি তা আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নতসম্মত হয় তাহলে তা গ্রহণ করবে আর যদি কিতাব ও সুন্নতের খেলাফ হয় তাহলে তা বর্জন করবে। ' ইমাম জাওয়াদ (আ.) আরও বলেন : এই রেওয়ায়েত (আবু বকর সম্পর্কে) আল্লাহর কিতাব ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জ শীল নয়। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)

" এবং নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার আত্মা তাকে যা কিছু প্ররোচনা দেয় তাও আমরা অবগত আছি এবং আমরা (তার) জীবন- শিরা অপেক্ষাও তার অধিকতর নিকটে আছি (সূরা ক্বাফ : ১৬)। "

তুমি কি বলতে চাও আবু বকরের সন্তুষ্টি অথবা অসন্তুষ্টি আল্লাহর নিকট লুকায়িত আছে যে তিনি ঐ বিষয়ে রাসূলকে প্রশ্ন করবেন? এটা বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণরূপে অস ব।

ইয়াহিয়া আবারও প্রশ্ন করল : রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বকর এবং ওমর জমিনের বুকে আসমানে জিব্রাইল (আ.) ও মিকাইল (আ.)- এর অনুরূপ; এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

ইমাম জাওয়াদ (আ.) বললেন : এই হাদীসের ব্যাপারেও যথেষ্ট সতর্ক মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা জিব্রাইল ও মিকাইল (আ.) আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত দুই ফেরেশতা, তারা কখনোই গোনাহ করেনি এবং এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহর অবাধ্য হননি। কিন্তু আবু বকর ও ওমর পূর্বে মুশরিক ছিল। যদিও ইসলামের আগমনের পর মুসলমান হয়েছিল কিন্তু তাদের জীবনের অধিকাংশ সময়কেই শিরক ও মূর্তিপূজার মাধ্যমে অতিবাহিত করেছিল।

সুতরাং এটা একান্তই অস ব যে, আল্লাহতায়ালা তাদেরকে জিব্রাইল ও মিকাইল (আ.)- এর সাথে তুলনা করবেন।

ইয়াহিয়া বলল : অনুরূপ অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে যে, আবু বকর ও ওমর বেহেশতের বৃদ্ধদের সর্দার। এ হাদিস সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

ইমাম জাওয়াদ (আ.) বললেন : এ হাদীস কোন ক্রমেই সঠিক হতে পারে না। কেননা বেহেশত বাসীরা সকলেই যুবক এবং সেখানে বৃদ্ধদের কোন স্থানই নাই। অতএব, আবু বকর ও ওমরকে তাদের সর্দার হওয়ার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। বনি উমাইয়ারা এই হাদীসকে রাসূল (সা.)-এর ঐ হাদীসের মোকাবেলায় জাল করেছে যাতে[১৩] রাসূল (সা.) বলেছেন :

الحسن والحسين سيد الشباب اهل الجنة

"হাসান ও হুসাইন বেহেশতের যুবকদের সর্দার"।

ইয়াহিয়া আবারও প্রশ্ন করল : হাদীসে আছে ওমর বেহেশতের প্রদীপ। ইমাম জাওয়াদ (আ.) জবাবে বললেন : ইহাও অস ব। কেননা বেহেশতে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, আদম (আ.), রাসূল (সা.) এবং সকল নবিগণ উপস্থিত থাকবেন, তবে বেহেশত তাঁদের নূরে নূরানী না হয়ে ওমরের নূরে নূরানী হবে, কিরূপে স ব?!

ইয়াহিয়া আবারও বলল : ওমর যা বলে তা ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে বলে। ইমাম জাওয়াদ (আ.) উত্তরে বললেন : আমি ওমরের ব্যপারে কিছু বলতে চাচ্ছিনা কিন্তু যেহেতু তোমাদের দৃষ্টিতে ওমরের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত আবু বকর মিম্বরের উপরে বলত :

انّ لي شيطاناً يعتريني

'আমার ঘাড়ে একটা শয়তান আছে, সে আমাকে বিচ্যুত করে।'

যখনই দেখবে যে, আমি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছি আমাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। ' তাছাড়া ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়না যে, ওমর ফেরেশতাদের পক্ষ হতে কথা বলত, এটি নিছক দাবী বৈ কিছুই নয়।

ইয়াহিয়া বলল : হাদীসে পাওয়া যায় যে, রাসূল (সা.) বলেছেন : 'যদি আমি নবুওয়াত প্রাপ্ত না হতাম তাহলে ওমর নবুওয়াত প্রাপ্ত হতো।'[১৪] ইমাম জাওয়াদ (আ.) জবাবে বললেন : আল্লাহর কিতাব এই হাদীস অপেক্ষা অধিক সত্য। আল্লাহতায়ালা কোরআনে কারিমে বলেছেন :

(وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)

" এবং (স্মরণ রাখ) যখন আমরা নবীদের নিকট হতে তাঁদের অ ীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ , ইবরাহীম, মূসা এবং মারিয়ামের পুত্র ঈসার নিকট হতেও বস্তুতঃ আমরা তাদের সকলের নিকট হতেই এক দৃঢ় অ ীকার গ্রহণ করেছিলাম (সূরা আহযাব : ৭)। "

এই আয়াত থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীদের নিকট থেকে অ ীকার গ্রহণ করেছেন, এমতাস্থায় কিরূপে স ব যে তারা অ ীকার ভ করবেন? তাছাড়া কোন নবীই চোখের পলক পড়ার ন্যায় সামান্যতম শিরকও করেননি। কিরূপে স ব যে, মহান আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে নবুওয়াত দান করবেন যে জীবনের অধিকাংশ সময়কেই শিরকের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে?!

রাসূল (সা.) আরও বলেছেন : "যখন আদম (আ.) মাটি ও পানির মধ্যে ছিলেন (অর্থাৎ যখন আদম সৃষ্টিই হননি) আমি তখনও নবী ছিলাম। "

পুনরায় ইয়াহিয়া প্রশ্ন করল : হাদীসে আছে রাসূল (সা.) বলেছেন : "সাধারণত আমার কাছে ওহী আসা বন্ধ হতো না, তবে যদি তেমনটি ঘটত তবে মনে করতাম খাত্তাব পরিবারের উপর ওহী নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ নবুওয়াত আমার কাছ থেকে তাদের কাছে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে ।

ইমাম জাওয়াদ (আ.) জবাবে বললেন : এটাও অস ব। কেননা এটা হতেই পারেনা যে, রাসূল (সা.) তাঁর নবুওয়াতের প্রতি সন্দেহ করবেন। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

(اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ)

" আল্লাহতায়ালা মনোনীত করে থাকেন রাসূলগণকে ফেরেশতাগণের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতেও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (সূরা হজ্ব : ৭৫)। "

সুতরাং আল্লাহর মনোনয়নের পর কোন নবীর জন্য তার স্বীয় নবুওয়াতের প্রতি কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকেনা।

ইয়াহিয়া পুনরায় প্রশ্ন করল : হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন : "যদি আজাব নাজিল হতো ওমর ভিন্ন আর কেউই তা থেকে পরিত্রাণ পেত না। "

ইমাম জাওয়াদ (আ.) জবাব দিলেন : এটাও অস ব। কেননা আল্লাহতায়ালা তাঁর রাসূলকে বলেছেন :

(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)

" এবং আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন এমতাবস্থায় যে, তুমি তাদের মধ্যে রয়েছ এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন (সূরা আনফাল : ৩৩)।

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল (সা.) জনগণের মধ্যে থাকবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানেরা ক্ষমা প্রার্থনা করবে ততক্ষণ আল্লাহতায়ালা তাদেরকে আজাব দিবেন না।[১৫]

ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর শাহাদাত

মামুন ২১৮ হিজরীতে মারা গেলে তার ভাই মো ' তাসেম তার স্থলাভিষিক্ত হয়। সে ইমাম জাওয়াদকে নিকট থেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ২২০ হিজরীতে ইমামকে পুনরায় বাগদাদ নিয়ে আসে। যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, চোরের হাতের কোন অংশ কাটা হবে তা নির্ধারনের জন্য যে বৈঠকের আয়োজন করা হয় ইমাম জাওয়াদও (আ.) তাতে উপস্থিত ছিলেন। বাগদাদের কাজী ইবনে দাউদ সহ অন্যান্যরা ইমাম জাওয়াদের কাছে পরাজিত হয়ে লজ্জিত হয়। তার কিছুদিন পর ইবনে আবি দাউদ ঈর্ষা এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে মো ' তাসেমের কাছে গিয়ে বলল :

শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, কিছুদিন পূর্বে যা ঘটে গেল তা আপনার হু মতের জন্য মোটেও কল্যাণকর নয়। কেননা আপনি সকল জ্ঞানী ও রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সামনে আবু জাফর অর্থাৎ ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর ফতোয়াকে (যাকে অধিকাংশ মুসলমানেরা ইসলামের খলিফা এবং আপনাকে হকের আত্মসাৎকারী মনে করে) অন্যদের উপর প্রাধান্য দিলেন। এ খবর জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা শিয়াদের জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ।

ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর সাথে চরমভাবে শত্রুতা পোষণকারী মো ' তাসেম, ইবনে আবি দাউদের বক্তব্য দ্বারা পুলকিত হলো এবং ইমামকে শহীদ করতে প্রয়াসী হলো। অতঃপর ২২০ হিজরীর যিলকদ মাসের শেষের দিকে ইমাম জাওয়াদকে শহীদ করে স্বীয় জঘন্য উদ্দে শ্য চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়।

ইমাম আবু জাফর আলী আল জাওয়াদ (আ.)- এর পবিত্র দেহ মোবারককে বাগদাদের রাইশ সমাধিস্থলে তাঁর পিতামহ হযরত ইমাম মূসা ইবনে জাফরের মাজারের পাশে সমাহিত করা হয়।[১৬] তাঁর এবং তাঁর বংশধরের উপর আল্লাহর দরুদ বর্ষিত হোক। এ দু ' মহামানবের মাজার শরীফ বর্তমানে "কাযেমাইন" নামে সুপরিচিত এবং যুগ যুগ ধরে তা মুসলমানদের পবিত্র স্থান ও যিয়ারতগাহ হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

হযরত ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর ছাত্রগণ

রাসূল (সা.)- এর ন্যায় আমাদের পবিত্র ইমামগণও (আ.) জনগণের শিক্ষা- দীক্ষার জন্যে বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতেন। অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে, তাঁদের কার্যাবলী সাধারণ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করা চলবে না। কেননা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষাদান করে থাকে। আর এ নির্ধারিত সময়ের বাইরে বন্ধ থাকে। কিন্তু মাসুম ইমামগণ (আ.) সার্বক্ষণিকভাবে জনগণের পথপ্রদর্শন ও শৃঙ্খলা বিধানের কাজে নিয়োযিত ছিলেন।

তাঁদের আচার- ব্যবহার (চাল- চলন), ওঠা- বসা (জীবন- যাপন), এমনকি দৈনন্দিন জীবন ধারার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ও জনসাধারণের জন্য শিক্ষণীয় ছিল। কোন ব্যক্তি যখনই তাঁদের সাথে বসতেন, তাঁদের নৈতিক চরিত্র এবং জ্ঞান থেকে উপকৃত ও সৌভাগ্যবান হতেন। কারো প্রশ্ন থাকলে উপস্থাপন করত এবং ইমামগণ তার যথাযথ উত্তর দিতেন। আর প্রশ্নের ক্ষেত্রেও কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। যে কোন সম া সম্পর্কে জানতে চাইলে তার যথার্থ জবাব পেত।

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নমুনা একমাত্র রাসূলগণ ও ইমামগণের নিকটে ছাড়া আর কোথাও কখনও ছিলনা বা নেই। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে, এরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকারিতা কতইনা বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয় হতে পারে। এ কারণেই অত্যাচারী উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খলিফারা জানত যে, যদি জনগণ পবিত্র ইমামগণের এ সকল বৈশিষ্ট্যকে জানতে পারে তাহলে তারা আল্লাহর মনোনীত নেতা এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ইমামগণের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। তখন তাদের (অর্থাৎ এই জবর দখলকারীদের) হু মত হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। সেহেতু তারা যথাস ব চেষ্টা করত জনগণ যেন স্বাধীনভাবে ইসলামের প্রকৃত এবং যোগ্য নেতাদের সাথে যোগাযোগ না রাখতে পারে। শুধুমাত্র ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সময় ইমাম মুহাম্মদ বাকের (আ.) কয়েক বছর সুযোগ পেয়েছিলেন। কেননা আবদুল আজিজের আচরণ কিছুটা মনুষ্যসুলভ ছিল। অপর দিকে উমাইয়া শাসনের অবসান এবং

আব্বাসীয় শাসনের পূর্বে ইমাম জাফর সাদেক (আ.) কিছুটা সুযোগ পেয়েছিলেন। আর এসময়ে জনগণ বেশ স্বাধীনভাবে এ মহামানবের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারতেন এবং ধন্য হতেন।

সে কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, ইমাম সাদেক (আ.)- এর ছাত্র এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রায় চার সহস্রাধিক। (রেজালে শেখ তুসী, পৃ. ১৪২- ৩৪২)। কিন্তু অন্যান্য অত্যাচারী খলিফাদের আমলে ইমামগণের ছাত্র এবং তাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা বেশ কম ছিল। যেমন, ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর ছাত্র এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মাত্র ১১০ জন ছিল। (রেজালে শেখ তুসী, পৃ. ৩৯৭- ৪০৯)।

এটা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ মহান ইমামের সাথে জনগণের যোগাযোগ কতটা সীমিত হয়ে পড়েছিল। এতদসত্ত্বেও এ সীমিত সংখ্যক ছাত্রগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক উজ্জ্বল চেহারা বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তাদের কয়েকজনের প্রতি ইি ত করা হলো।

১. আলী ইবনে মাহযিয়ার : তিনি ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর বিশেষ সাথী ও প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ইমাম হাদী (আ.) ও ইমাম রেজা (আ.)- এর সাহাবী হিসাবেও গণ্য। আলী ইবনে মাহযিয়ার খুব বেশী ইবাদত করতেন এবং দীর্ঘ সিজদা করার কারণে তার কপালে চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল। সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে সিজদায় যেতেন এবং একসহস্র মুমিনের জন্য দোয়া করে তবেই সিজদা থেকে মাথা তুলতেন। আল্লাহর কাছে নিজের জন্য যে দোয়া করতেন তাদের জন্যও সে প্রার্থনাই করতেন।

আলী ইবনে মাহযিয়ার ইরানের আহওয়ায প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি ত্রিশোর্ধ সংখ্যক মূল্যবান বই লিখে গিয়েছিলেন। (আল নি ওয়াল আল কাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৪)। তিনি ঈমান ও আমলের এমন সম্মানিত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যে স্বয়ং ইমাম জাওয়াদ (আ.) তার প্রশংসা করে লিখেন :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হে আলী! মহান আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন, বেহেশতবাসী করুন এবং উভয় জগতের লাঞ্ছনা থেকে তোমাকে রক্ষা করুন। আর আখেরাতে আমাদের (আহলে বাইতের) সাথে একত্রে পুনরুত্থিত করুন। হে আলী! আমি তোমাকে

তোমার কল্যাণকামিতা, আনুগত্য, মর্যাদা, সেবা এবং যা কিছু পালন করা তোমার জন্য ওয়াজিব তা পরীক্ষা করেছি। যদি বলি তোমার মত কর্তব্য পরায়ণ আর কাউকেই পাইনি, তাহলে তা মিথ্যা বা বাড়িয়ে বলা হবে না। আল্লাহতায়ালা তোমাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। তোমার মর্যাদা এবং তোমার শীত, গ্রীষ্ম ও দিবারাত্রির সার্বক্ষণিক শ্রম ও সেবা আমার কাছে গোপন নেই। আল্লাহর দরবারে এ প্রার্থনা করছি যে, পুনরুত্থান দিবসে যখন সকলকে একত্রিত করা হবে, তখন তোমাকে তিনি এমন বিশেষ রহমত দান করুন, যেন অন্যরা তা দেখে অনুশোচিত হয় এবং অনুরূপ সৌভাগ্য কামনা করে। (انّه سميع الدعاء) "নিশ্চয় তিনি দোয়া শ্রবনকারী"। (আল গাইবাহ, শেখ তুসী, পৃ. ২২৫, বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ১০৫)

২. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি নাসর বাযানতী: তিনি ফার অধিবাসী এবং ইমাম রেযা (আ.) ও ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর বিশেষ সাথী হিসাবে গণ্য হতেন। তিনি এ দু' মহান ও পবিত্র ইমামের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক কিতাবও লিখে গেছেন তার মধ্যে "আল জামে" উল্লেখযোগ্য। সকল শিয়া মনীষীরা তার ইজতেহাদকে গ্রহণ করেন এবং তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। (মো' জামে রিজালুল হাদীস, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৭; রিজালে কাশশী, পৃ. ৫৫৮)

তিনি সেই ব্যক্তি যে তিন জনকে সাথে নিয়ে ইমাম রেযা (আ.)- এর সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হন এবং ইমাম রেযা (আ.) তাকে উদার হৃ বিশেষ ভালবাসা দান করেন।

৩. যাকারিয়া ইবনে আদম: তিনি ইরানের পবিত্র নগরী কোমের অধিবাসী ছিলেন এবং বর্তমানে তার মাজার কোম শহরে সুপরিচিত। তিনি ইমাম রেযা (আ.) ও ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর অতি নিকটতম সাথী হিসাবে গণ্য হতেন। ইমাম জাওয়াদ (আ.) তার জন্য দোয়া করেছেন এবং তাকে নিজের আস্থাভাজন সাথি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। (রেজালে কাশী, পৃ. ৫০৩)

যাকারিয়া একদা ইমাম রেযা (আ.)- এর খেদমতে পৌঁছলে ইমাম রেযা (আ.) রাত্রের প্রথম ভাগ থেকে সকাল পর্যন্ত তার সাথে একান্তে কথা বলেন। (মুনতাহাল আমাল, পৃ. ৮৫)। কোন এক ব্যক্তি ইমাম রেযার কাছে প্রশ্ন করেন : আমি অনেক দূরে থাকি তাই সকল প্রয়োজনে আপনার

সাথে সাক্ষাৎ করা আমার জন্য বেশ কষ্ট সাধ্য। কার কাছে গেলে ইসলামের বিধি- বিধান সঠিকভাবে জানতে পারব?

ইমাম রেযা (আ.) বললেন : যাকারিয়া ইবনে আদমের কাছে গেলে জানতে পারবে। কেননা সে দীন ও দুনিয়া সংক্রান্ত বিধি- বিধানের বিষয়ে নির্ভরযোগ্য। (রেজালে কাশী, পৃ. ৫৯৫)

৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে বাযিই: তিনি ইমাম কাযেম (আ.), ইমাম রেযা (আ.) ও ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর বিশেষ প্রিয়ভাজন এবং শিয়াদের নিকট নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, পুণ্যবান এবং ধার্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বহুসংখ্যক কিতাবও তিনি লিখেছেন। এমতাবস্থায় তিনি আব্বাসীয়দের দরবারে চা রীও করতেন। (রেজালে নাজ্জাশী, পৃ. ২৪৫)। এব্যাপারে ইমাম রেযা (আ.) তাকে বলেন : অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তাঁর এমন সকল বান্দাগণকে পাঠান যাদের মাধ্যমে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্পষ্ট হয়। শহরে তাদেরকে ক্ষমতা দান করেন, যাতে করে তাদের মাধ্যমে তাঁর বন্ধু এবং ওলীগণ অত্যাচারীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পান এবং মুসলমানদের সার্বিক সম ার সমাধান হয়। তারা দুর্ঘটনা এবং বিপদে মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তার স্থান স্বরূপ। শিয়াদের মধ্যে অভাবগ্র এবং দায়গ্রস্থরা নিজেদের সম া সমাধানের জন্য তাদের কাছে গিয়ে সাহায্য পায়। এরূপ ঈমানদার ব্যক্তিদের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা মুমিনদেরকে অত্যাচারীদের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা দান করেন। তারা প্রকৃত ঈমানদার এবং ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর আস্থাভাজন বান্দা। পুনরুত্থান দিবস তাদের নূরে আলোকোজ্জ্বল থাকবে। তারা বেহেশতের জন্যে এবং বেহেশত তাদের জন্যে সৃজিত হয়েছে।

অতঃপর ইমাম (আ.) বললেন : তোমাদের মধ্যে যে কেউ ইচ্ছা করলে এ সকল মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারবে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল নিবেদন করল : আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ হোক। কিরূপে?

ইমাম বললেন : যদি কেউ অত্যাচারীদের সাথে থেকে শিয়াদেরকে খুশী (সাহায্য) করার মাধ্যমে আমাদেরকে খুশী করবে। (সে যে পর্যায়েই থাকনা কেন, তার উে শ্য হবে ঈমানদারগণের উপর থেকে জুলুম ও অত্যাচার নিবারণ করা)।

পরিশেষে ইমাম বললেন : এই মুহাম্মদ, তুমিও তাদের মত হওয়ার চেষ্টা কর। (রেজালে নাজ্জাশী, পৃ. ২৫৫)। কেননা ইসমাইল আব্বাসীয় খলিফা মামুনের উজির ছিল।

হুসাইন ইবনে খালেদ বলেন, বন্ধুদেরকে নিয়ে ইমাম রেযা (আ.)- এর খেদমতে পৌঁছলাম। কথা প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বাযিয়ির কথা উঠলে ইমাম বললেন : আমি তোমাদের মধ্যে তার (ইসমাইল) মত ব্যক্তিত্ব দেখতে চাই। (রেজালে কাশশী, পৃ. ৫৬৪)

মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া বলেন : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে বেলালের সাথে ইসমাইলের মাজার যিয়ারতে গেলাম। মুহাম্মদ ইবনে আলী ইসমাইলের কবরের মাথার কাছে কেবলা মুখী হয়ে বসে সে বলল : এই কবরে যে শায়িত আছে সে আমাকে বর্ণনা করেছে যে, ইমাম জাওয়াদ) আ (.বলেছেন : "যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইয়ের কবর যিয়ারত করবে এবং তার কবরের পাশে কেবলামুখী হয়ে বসে কবরে হাত রেখে ৭বার সুরা কদর

(انّ انزلناهُ في ليلة القدر)

পাঠ করবে, সে কিয়ামত দিবসের মহা আতঙ্ক ও ভীতি থেকে নিরাপদ থাকবে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে বাযিই বলেন : আমার কাফন তৈরী করার জন্য ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর কাছে তার একটি জামা চেয়েছিলাম। তিনি আমার জন্য একটি জামা পাঠান এবং ঐ জামার বোতাম গুলি খুলে রাখার আদেশ দেন। (রেজালে কাশী, পৃ. ২৪৫- ২৬৪)।

ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর কিছু মূল্যবান বাণী

পবিত্র ইমামগণের বাণীসমূহ হলো তাঁদের জ্ঞান সূর্যেরই এক দীপ্তিময় শিখা। আল্লাহর বান্দাগণের জন্য তা উজ্জ্বল এবং নিশ্চিত পথনির্দেশনা স্বরূপ। কেননা এ মহামানবগণ সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। মানুষের সার্বিক দিক বিবেচনা করেই পবিত্র ইমামগণ পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, কোন এক বিশেষ দিক বিবেচনা করে নয়। তাঁরা এ পথ নির্দেশনা কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে বিবেচনা করেও প্রদান করেন না, বরং সকল শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মানুষকে মানবিক উৎকর্ষের দিকে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত হয়ে থাকে, তাঁদের এ সার্বিক দিক নির্দেশনা। আর তা মানুষের সকল পর্যায়ের ফেতরাতসমূহকে জাগ্রত ও আন্দোলিত করতে সহায়তা করে থাকে।

এখন আহলে সুন্নাতের কিতাব থেকে নবম ইমাম হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী আল জাওয়াদ (আ.)- এর পবিত্র বাণীসমূহ থেকে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। আশা করি, এ পথনির্দেশনা থেকে আমরাও উপকৃত হব।

مَنِ استَغنَی بِاللهِ اِفتقَرَالنّاسُ اِلَیهِ و مَن اِتَّقَی الله اَحَبَّهُ النّاسُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং মানুষের মুখাপেক্ষী না হয়, মানুষ তার প্রতি নির্ভরশীল হয়। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া (খোদাভীরুতা) অবলম্বন করে সে মানুষের নিকট প্রিয় ভাজন হয় (নুরুল আবসার, পৃ. ১৮০)।

الکمالُ فی العقلِ

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির পূর্ণতা হলো তার বুদ্ধিমত্তায় বা বিচক্ষণতায়। (আল ফুসুলুল মুহিম্মাহ, পৃ. ২৯০)।

حسبُ المرءِ مِن کمالِ المُرُوَّةِ اَن لایلقی اَحَداً بما یَکرهُ

অর্থাৎ যা সে নিজের জন্য অপছন্দ করে, কারো প্রতি ঐরূপ আচরণ না করাই হলো পরিপূর্ণ মহানুভবতা (নূরুল আবসার, পৃ. ১৮০)।

لا تعالجوا الامرَ قبلَ بُلُوغِهِ فَتَندَمُوا ولا يَطُولَنَّ عليكم الامَلُ فتقسوا قلوبكم و ارحموا ضعفائكم و اطلبوا من الله الرحمة بالرحمة فيهم

অর্থাৎ যে কর্মের সময় এখনো আসেনি তার জন্য তাড়াহুড়া করো না, করলে অনুতপ্ত হবে। আকাশচু¤ি¦ আশা- আকাক্সক্ষা করোনা, কেননা তার মাধ্যমে আত্মা পাষন্ড ও কঠিন হয়। দুর্ব্বল- অক্ষমদের প্রতি দয়া কর এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর (আল ফুসুলুল মোহেম্মাহ, পৃ. ২৯২) ।

مَن اِستَحسَنَ قبيحاً شريكاً فيهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অসৎকর্মের (কদর্যতার) প্রশংসা করে সে ঐ অসৎকর্মের অংশীদার (নূরুল আবসার, পৃ. ১৮০)।

العامل باالظلم و المعين عليه والرّاضى شركاءُ

অর্থাৎ অত্যাচারী ও তার সাহায্যকারী এবং ঐ অত্যাচারের প্রতি তুষ্টি জ্ঞাপনকারীর প্রত্যেকেই অত্যাচারীর সমান (আল ফুসুলুল মুহিম্মাহ, পৃ. ২৯১)।

مَن وعظ اخاه سراً فقد زانه و مَن وعظهُ علانية فقد شانه

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে গোপনে উপদেশ দিল সে তাকে অলংকৃত করল। আর যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে প্রকাশ্যে নসিহত করল সে তার সামাজিক ভাবমূর্তিকে ভুলুণ্ঠিত করল (নূরুল আবসার, পৃ. ১৮০)।

القصد الي الله باالقلوب ابلغُ من اثباتِ الجوارح بالاعمال

অর্থাৎ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে স্মরণ করা, অমনোযোগের সাথে অ - প্রত্য কে কার্যে নিয়োজিত করার চেয়ে বেশি কার্যকরী (আল ফুসুলুল মুহিম্মাহ, পৃ. ২৮৯)।

يوم العدل علي الظا لم اشدُّ من يوم الجور على المظلوم

অর্থাৎ অত্যাচারের দিন অত্যাচারিতের জন্য যতটা কষ্টদায়ক, ন্যায়বিচারের দিন অত্যাচারীর জন্য তার চেয়ে অধিক কষ্টদায়ক (আল ফুসুলুল মুহিম্মাহ, পৃ. ২৯১)।

عنوان صحيفة المسلم حسن خلقه

অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবসে মুসলমানদের আমলনামা তাদের সুন্দর আচার- ব্যবহার দ্বারা শুরু করা হবে (নূরুল আবসার, পৃ. ১৮০)।

ثلاثٌ يبلِّغنَ بالعبد رضوان الله تعالى كثرة الاستغفار و لين الجانب و كثرة الصدقة و ثلاث من كنَّ فيه لم يندم : ترك العجلة والمشورة والتوكّل على الله عند العزم

অর্থাৎ তিনটি জিনিসের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে : ১. আল্লাহর কাছে অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করা ২. মানুষের সাথে নমনীয় আচরণ করা ৩. অধিক সদকা দেওয়া। তিনটি বৈশিষ্ট্য কারো মধ্যে থাকলে সে কখনোই অনুতপ্ত হবে না। ১. কোন কার্যে চঞ্চলতা প্রদর্শন না করা ২. পরামর্শ করে কাজ করা ৩. আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কার্য শুরু করা (আল ফুসুলুল মুহিম্মাহ, পৃ. ২৯১)।

من امل فاجراً كانَ ادنى عقوبته الحرمان

অর্থাৎ যে ব্যক্তি চরিত্রহীন- পাপাচারীর প্রতি আশাবাদী হয় তার এ অপরাধের নূন্যতম শাি হচ্ছে বঞ্চনা (নূরুল আবসার, পৃ. ১৮১)।

من انقطع الى غير الله وكله الله اليه و من عمل على غير علم افسد اكثر ممّا يصلح.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি আশাবাদী হয়, আল্লাহতায়ালা তাকে ঐ ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেন। আর যে ব্যক্তি পর্যাপ্ত জ্ঞান ও তথ্য ছাড়াই কোন কার্য সম্পাদন করে তার সুফলের চেয়ে ফলই বেশি (আল ফুসুলুল মুহিম্মাহ, পৃ. ২৮৯)।

اهل المعروف الى اصطناعه احوج من اهل الحاجة اليه لانّ لهم اجرهم و فخره و ذكره فمهما اصطنع الرجل من معروفٍ فانّما يبتدئُ فيه بنفسه

অর্থাৎ কল্যাণকারীদের কল্যাণ কর্ম সাধনের প্রয়োজনীয়তা অভাবগ্র দের চেয়ে বেশি। কেননা পরোপকারিতা ও বদান্যতা তাদের জন্যে পুরস্কার, গৌরব এবং সুখ্যাতি বয়ে আনে। সুতরাং সৎকর্মপরায়ণগণ যখনই কোন জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন করেন মূলতঃ প্রথমে নিজের প্রতিই কল্যাণ করেন (নূরুল আবসার, পৃ. ১৮০)।

العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى، والصبر زينة البلاء، والتواضع زينة الحسب، و الفصاحة زينة الكلام، والحفظ زينة الرواية، و خفض الجناح زينة العلم، و حسن الادب زينة العقل، و بسط الوجه زينة الكرم، و ترك المن زينة المعروف، والخشوع زينة الصلواة، و ترك ما لا يعنى زينة الورع

অর্থাৎ সচ্চরিত্র দারিদ্রের অলঙ্কার। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (আল্লাহর প্রতি শোকর) সম্পদশালীর অলঙ্কার। ধৈর্য- স্থৈর্য, বালা- মুসিবতের অলঙ্কার। নমনীয়তা মহত্ত্বের অলঙ্কার। ভাষার প্রাঞ্জলতা (দক্ষতা) বক্তব্যের অলঙ্কার। সংরক্ষণ এবং মুখস্থ করা বর্ণনার (হাদিসের) অলঙ্কার। সৌজন্যবোধ (বিনয়) জ্ঞানের অলঙ্কার। শিষ্টাচার বুদ্ধিমত্তার অলঙ্কার। সদাহা বদন (আনন্দচিত্ত) দয়াশীলতা এবং মহানুভবতার অলঙ্কার। কল্যাণ কামিতা বদান্যতার অলঙ্কার। মনোযোগ এবং নিষ্ঠা নামাজের অলঙ্কার। অনর্থক কার্য পরিত্যাগ করা খোদাভীরুতা ও পরহেজগারীর অলঙ্কার (আল ফুসুলুল মুহিম্মাহ, পৃ. ২৯১)।

من وثقَ باالله و توكل علي الله نجاه الله من كلَ سوءٍ و حرز من كل عدو

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল হবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে সকল অনিষ্ট থেকে মুক্তি দিবেন এবং সকল প্রকার শত্রুতা থেকে সংরক্ষণ করবেন (নূরুল আবসার, পৃ. ১৮০)।

الدين عزٌّ، والعلم كنزٌ، والصمتُ نورٌ، ولا هدم للدين مثل البدع، ولا افسد للرجال من الطمع، و بالراعى تصلح الرعية، و بالدعاء تصرف البلية

অর্থাৎ দীন হচ্ছে মর্যাদার উৎস। জ্ঞান হলো ঐশ্বর্য (গুপ–ধন)। নীরবতা হলো নূর। কোন কিছুই বেদয়াতের ন্যায় দীনকে ধ্বংস করে না। কোন কিছুই লোভ- লালসার মত মানুষকে নষ্ট করে না। যোগ্য ও পূণ্যবান রাষ্ট্রনায়ক কর্তৃক মানুষ (জনগণ) সংশোধিত হয়। দোয়া এবং প্রার্থনার মাধ্যমে বিপদ- আপদ দূরীভুত হয় (আল ফুসুলুল মুহিম্মাহ, পৃ. ২৯০)।

الصبر على المصيبة مصيبة للشامت

অর্থাৎ বিপর্যয় এবং মুছিবতে কারো ধৈর্যধারণ, তার শত্রুর জন্যে মুছিবত ¯¦ রূপ। কেননা সে (দুশমন) অন্যের দুঃখে তিরস্কার এবং আনন্দ প্রকাশ করতে চায় (নুরুল আবসার, পৃ. ২৯০)।

كيف يضيع من الله كافله و كيف ينجو من الله طالبة

অর্থাৎ কিরূপে স ব যে, আল্লাহ্ তায়ালা যার পৃষ্ঠপোষক সে ধ্বংস হয়ে যাবে! আর কিরূপে স ব আল্লাহ্ যার অনিষ্ট চান সে নিস্কৃতি পাবে (আল ফুসুলুল মুহিম্মাহ, পৃ. ২৮৯)।

قال عليه السلام فى جواب رجل قال له اوصنى بوصية جامعة مختصرة قال صن نفسك عن عار العاجلة و نار الاجلة

অর্থাৎ এক ব্যক্তি ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর কাছে অনুরোধ করল, আমাকে সংক্ষেপে যথাযথ উপদেশ দান করুন। ইমাম জাওয়াদ (আ.) বললেন : "নিজেকে সেই সকল কর্ম থেকে বিরত রাখ, যা দুনিয়াতে অপমান ও আখেরাতে আযাবের (শাি র) কারণ (ইহকা ল হাক, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৪৩৯)।"

তথ্যসূত্র :

১। আনওয়ারুল বাহিয়্যাহ্, পৃ. ১২৫; উসূলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ.৩২১; এরশাদ, শেখ মুফিদ, পৃ. ২৯৯।

২। উসূলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২১, এরশাদ, শেখ মুফিদ, পৃ. ২৯৮।

৩। স্থানটি রা'সুল হুসাইন নামে (رأس الحسين) সুপরিচিত।

৪। এরশাদ, শেখ মুফিদ, পৃ. ৩০৪, এলামুল ওয়ারা, পৃ. ৩৩২; ইহকা ল হাক, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৪২৭; আল ফুসুলুল মুহিম্মাহ, পৃ. ২৮৯।

৫। মুনতাহাল আমাল, পৃ.৬৭; উয়ুনুল আখবার, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭; বিহারুল আনওয়ার, ৪৯তম খণ্ড, পৃ. ৩০৩।

৬। (مَسجِد) মাসজিদ, জিমে কাসরা (مَجلِس) মাজলিস এর সদৃশ অথবা জিমে ফাতহা (مَشعَل) মাশয়াল এর সদৃশ, উভয়েরই বহুবচন مَساجِد))মাসাজিদ অর্থাৎ সিজদার স্থান। একই ভাবে মসজিদসমূহ, আল্লাহর ঘর এবং যে স্থানে কপাল রাখা হয় তা সিজদার স্থান হিসাবে গণ্য এবং কপাল সহ মোট সাতটি অ (দুই হাতের তালু, দুই পায়ের বৃদ্ধা ুল, দুই হাটু) যাদের মাধ্যমে আমরা সিজদা করি, সিজদার স্থান হিসাবে পরিগণিত। আর এর ভিত্তিতেই এই রেওয়ায়েতে (المساجِد) আল মাসাজিদ শ টিকে সাতটি অ যার মাধ্যমে সিজদা করা হয়, অর্থে তফসীর করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অপর একটি হাদিসে ইমাম সাদিক (আ.) হতে আল কাফী নামক গ্র এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে তাফসীরে আলী ইবনে ম্মীতে المساجِد আল মাসাজিদ শ টিকে সিজদার উল্লিখিত সাতটি অ অর্থেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শেখ সাদুক (রহ.) তাঁর "মানলা ইয়াহযারুল ফাকীহ" গ্র (المِسَاجِد) আল মাসাজিদ শ টিকে সিজদার উক্ত সাতটি অ অর্থেই তাফসীর করেছেন। সাঈদ ইবনে জুবাইর, যোজাজ এবং ফাররা ও (المِسَاجِد) শ টিকে উল্লিখিত অর্থে তফসীর করেছেন। অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে, যদি আল মাসাজিদ শ টিকে উল্লিখিত সিজদার সাতটি অ হিসাবে তাফসীর করা সঠিক না হতো, তাহলে মো'তাসেমের দরবারে উপস্থিত ফকীহরা এ বিষয়ে আপত্তি তুলত। কেন না তারা হযরত ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর ভুল ধরার জন্য চাতকের ন্যায় তাকিয়েছিল। সুতরাং যেহেতু উপস্থিত ফকীহরা কোন প্রকার আপত্তি করার অবকাশ পায়নি,

তবে তা এটাই প্রমাণ করে যে, তাদের দৃষ্টিতেও (المساجد) আল মাসাজিদ শ টির অর্থ হলো সিজদার উল্লিখিত সাতটি অ । তাফসীরে সাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫২; তাফসীরে নূরুছ ছাকালাইন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৪০, তাফসীরে মাজমাউল বায়ান, ১০ম খণ্ড, পৃ.৩৭২।

৭। জাহেলিয়াতের যুগে 'যিহারকে' তালাক হিসাব করা হতো এবং এর মাধ্যমে স্বামীর জন্য স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যেত কিন্তু ইসলামে এ হু মের পরিবর্তন ঘটে এবং হারাম ও কাফফারার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'যিহার' হলো যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে 'মা', 'বোন' অথবা 'মেয়ে' বলে, এ পরিস্থিতিতে ঐ স্বামীকে অবশ্যই কাফফারা দিতে হবে। আর এর মাধ্যমে স্ত্রী পুনরায় তার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

৮। এরশাদ, শেখ মুফিদ, পৃ. ২৯৯; তাফসীরে কোমী, পৃ. ১৬৯; ইহতিজাজে তাবারসী, পৃ. ২৪৫, বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ৭৪- ৭৫।

৯। উসুলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪; বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ৬০।

১০। তারিখে ইয়া বী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪।

১১। মুনতাহাল আমাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫। মুহা ে স কোমী এই বইয়ের একই পৃষ্ঠায় লিখেছেন : কোমের ইতিহাস থেকে স্পষ্ট যে যয়নাব, উম্মে মুহাম্মদ ও মাইমুনাহ নামে হযরতের আরও তিনটি কন্যা ছিল। যাদের কেউই মামুনের কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেনি।

১২। আল্লামা আমিনী তার আল গাদীর নামক গ্র ে র ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২১ প্রমাণ করেছেন যে এই হাদীস মিথ্যা এবং এটি মুহাম্মদ ইবনে বাবেশায়ের জালকৃত হাদিস।

১৩। আল্লামা আমিনী তার আল গাদীর গ্র ে র ৫ম খণ্ডের ৩২২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে , এটা ইয়াহিয়া ইবনে আনবাসাহের গড়া হাদীস এবং গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা সে একজন মিথ্যাবাদী এবং হাদীস জালকারী।

১৪। আল্লামা আমিনী প্রমাণ করেছেন যে, এই হাদীসের রাবিগণ মিথ্যাবাদী ছিলেন। আল গাদীর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১২- ৩১৬।

১৫। এহতেজাজে তাবরাসী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭, ২৪৮। বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ৮০- ৮৩।

১৬। এরশাদ, মুফিদ, পৃ. ৩০৭; এলামুল ওয়ারা, পৃ. ৩৮৮; বিহারুল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ৬; মুনতাহাল আ'মাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

সূচীপত্র :

ভূমিকা 3

ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর জন্ম 6

ইমামতের শুরু 10

ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর কিছু মুজিযাহ 13

ইমাম রেজা (আ.)-এর শাহাদতের সংবাদ 16

ষড়যন্ত্রমূলক বিয়ে 22

ইহরামের বিভিন্ন অবস্থায় শিকারের হুকুম নিম্নরূপ 26

ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর শাহাদাত 35

হযরত ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর ছাত্রগণ 36

ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর কিছু মূল্যবান বাণী 41

তথ্যসূত্র : 46